

ইউরোপের চিঠি



অম্বদা শংকর দায়

অন্নদাশঙ্কর রায়

ইউরোপের চিঠি

কলিকাতা

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ

প্রকাশক
শ্রীহৃদ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাট্টোজো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এই পুস্তকের কপিরাইট শ্রীমতী লীলা রায়ের
এর প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা

প্রথম প্রকাশ ১৯৪৩

দাম দেড় টাকা

মুদ্রক
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রেস প্রেস
৩০, কৰ্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা-৬
২ ৪ ৪ ২

মোচাক সম্পাদক
শ্রীস্বধীরচন্দ্র সরকার
কলকাত্নলেষু—

অসম্ভবশক্তিৰ ৰাজ
ছোটদেৱ উপন্যাস
পাহাড়ী

ভূমিকা

এগুলি প্রবন্ধ নয়, চিঠি। লেখা হয়েছিল “মৌচাক” মাসিকপত্রের পাঠক পাঠিকাদের জন্তে। কোনোটি ট্রেনে বা জাহাজে, কোনোটি কাকিতে।

তার পরে পনেরো ষোলো বছর কেটে গেছে। এত দিন এই চিঠিগুলি মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় গোপন ছিল। এখন এদের পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হলো। যারা পড়বে তারা আরেক যুগের ছেলে মেয়ে। তাদের সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান অনেক। কিন্তু তখনকার সেই আমি তো তাদের কাছাকাছি বয়সের।

এবার যে সব ছবি দেওয়া গেল সেগুলি আমার বন্ধু শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তিনি ও আমি এক সঙ্গে ইউরোপের নানা দেশ বেড়াই। আমাদের তখনকার সহযাত্রার স্মারক হিসাবে এই বইখানির কিছু মূল্য আছে।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে দুটি লেখা সংযোজিত হলো। “মিলানোতে মিলন” খুঁজে বার করেছেন শ্রীমান্ সুপ্রিয় সরকার আর “দেশে” উদ্ধার করেছেন শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ পাল। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কয়েকটি বাদে আর সব ছবি নতুন। এগুলি মণিদার সংগ্রহ থেকে নেওয়া। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

অন্নদাশঙ্কর রায়

সূচী

সুইটজারল্যাণ্ড	...	১
আইল অফ ওয়াইট	...	১২
ছেলেমেয়েদের থিয়েটার	...	২৩
জার্মেনী—সারল্যাণ্ড	...	৩৬
জার্মেনী—রাইনল্যাণ্ড	...	৪৭
জার্মেনী—বাভেরিয়া	...	৫৮
হাঙ্গেরী	...	৬৫
অস্ট্রিয়া	...	৭০
আবার জার্মেনী	...	৭৬
মধ্য জার্মেনী	...	৮১
চেকোস্লোভাকিয়া	...	৮৭
শেষ জার্মেনী	...	৯৩
ইটালী	...	৯৮
মিলানোতে মিলন	...	১০২
দেশে	...	১১৩



4 (Ski) 10-1

সুইটজারল্যান্ড

সুইটজারল্যান্ড হচ্ছে ইউরোপের মধ্যপ্রদেশ। আমাদের যেমন বিস্কা পর্বত, ওদেরও তেমনি আল্পস পর্বত। আল্পসের শাখা প্রশাখায় দেশটা ছেয়ে গেছে, আর সেই সব শাখা প্রশাখার মাঝে মাঝে এক একটি হ্রদ। দেশটি যেমন সুন্দর তেমনি স্বাস্থ্যকর। বৎসরের অধিকাংশ দিন বরফ পড়ে বা বরফ থাকে, পাহাড়ের চূড়া থেকে ঘরের আশপাশ অবধি কেবল শাদা মখ্মলের মতো বরফ বিছানো! আমাদের দেশে যেমন “চলতে গেলে দলতে হয় রে ছুঁবা কোমল” ওদের দেশে তেমনি চলতে গেলে দলতে হয় ছুঁক ফেননিভ রাশি রাশি বরফ। রাস্তার ওপরে ধুলোর মতো বরফ গুঁড়ো জমে রয়েছে, তার ওপরে পা ফেলতে মায়া হয়। চক্খড়ির গুঁড়োর ওপর তাঁটবার সময় কেমন মনে হয় সেইটে একবার কল্পনা করো, কেমন মস্ মস্ মুড় মুড় শব্দ করতে থাকে। যে বরফ আমরা ঘোলের সরবতের সঙ্গে খাই এ বরফ তেমন নিরেট নয়। এ বরফ

যখন পড়ে তখন পেঁজা তুলোর মতো খুব আ-স্তে আ-স্তে খুব মোলায়েমভাবে পড়ে, ভোর বেলাকার শিউলি ফুলের মতো নিঃশব্দে। বরফ পড়বার সময় বাইরে বেরিয়ে আরাম আছে, অবশ্য সর্বত্র গরম পোশাকে মুড়ে, পায়ে ডবল বুট চড়িয়ে এবং মাথায় টুপী পরতে না ভুলে। বৃষ্টিতে তো অনেক ভিজ্ছে, একবার যদি বরফে ভিজ্জে তো জানতে কেমন ফুঁর্তি! তবে মুশকিল এই যে পা পিছলে আছাড় খাবার সম্ভাবনা প্রতি পদেই। এ তো আর জল নয় যে মাটিতে পড়ে শ্রোত হয়ে পথ কেটে বয়ে যাবে, দাঁড়াবে না। এ হচ্ছে বরফ, এ যেখানে পড়ে সেখান থেকে নড়বার নাম করে না, যতদিন না সূর্যের উত্তাপ লেগে গলে যায়। ঘরের জানালা খোলা রাখলে আর রঞ্জে নেই, রাজ্যের বরফ এসে তোমারি ঘরে জড় হবে, তোমার ঘরে যদি খাবার জল থাকে তো সে জল জমে বরফ হয়ে যাবে, যদি দুধ থাকে তো দুধেরও সেই দশা! ঘরের দরজা জানালা প্রায় সারাক্ষণই বন্ধ রাখতে হয়, অবশ্য বাতাসের জন্তে ফাঁক রেখে। ঘরে সেন্ট্রাল হীটিংএর ব্যবস্থা থাকে, তার মোটামুটি মানে এই যে ঘরটাকে কৃত্রিম উপায়ে গরম রাখা হয়। বিছানা খুব পুরু করে পাতা দরকার, লেপ কম্বল এক দঙ্গল! ঘরে বসে জানালার কাঁচ দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে পারো—যতদূর চোখ যায় কেবল বরফ আর বরফ। “কোথায় এমন তুষার ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে! ও সে মাটির উপর ঢেউ খেলে যায় বরফ কাহার দেশে!”

সূর্যের আলো যখন সেই বরফের ওপর ঝকঝক করে সাত
 রঙে বিভক্ত হয়ে যায় আর চাঁদের আলো যখন সেই
 বরফের ওপর মুক্তোর মতো দাঁত বের করে হাসে, তখন সে
 যে কী অপূর্ব স্বপ্নের মতো মনে হয়, যেন দুধ-সাগরের
 কূলে এসে পৌঁছেছি, তার ওপারে রাজকন্যার ঘুমন্ত পুরীর
 দেউড়ীতে পর্বত পাহারা দিচ্ছে, পর্বতের পাগড়ীতে সাপের
 মাথার মণির মতো জ্বলছে আকাশের যত তারা !
 আঁধার রাত্রে সমস্ত খাঁ খাঁ করতে থাকে, আর বরফের ওপরে
 চোখ ফেললে মনে হয় যেন মড়ার মাথার খুলি। মাঝ রাত্রে
 ঘুম ভেঙে গেলে কন্বলের ভিতর থেকে মুখ বের করে তাকাই,
 আর জানালার সার্শীর ওপারের দৃশ্য চোখে পড়ে যায়। মা
 গো, সে কী ভয়ানক ! কী নিঃশব্দ ! যেন জ্যৈষ্ঠমাসের
 ছপুর বেলার রোদদুর ডিসেম্বর মাসের রাত্রে বেল। বরফ
 সেজে এসেছে, যেন দ্বাপর যুগের পুতনা রাক্ষসী শাদা কাপড়
 মুড়ি দিয়ে যোজন জুড়ে পড়ে রয়েছে, যেন হাজার হাজার
 ছোনাকী তারার মুখোস পরে অন্ধকারময় উড়ে বেড়াচ্ছে।
 তক্ষুনি চোখ বুজে মুখের ওপর কন্বল টেনে দিই। তার
 পরে আবার যখন ঘুম ভাঙে তখন শুয়ে শুয়ে ঘরের
 আয়নার দিকে চেয়ে দেখি ভোরের সূর্য আকাশ আলো
 করে পাহাড়ের শিয়রে সোনার কাটি ছুঁইয়ে দিয়ে বলছে
 —“জাগো।”

তখন দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বোতাম টিপে
 দিই : দাসীর ঘরে ঘটা বেজে ওঠে, সে গরম জলের পাত্র

নিয়ে দ্বারের ওপাশ থেকে টোকা দিলে ফরাসী ভাষায় বলি “জাঁত্রে” (প্রবেশ করতে পারো) ; ঘরে ঢুকে সে বলে “বঁঝুর মশিয়ে” (সুপ্রভাত, মহাশয়) ; সে চলে গেলে মুখ ধুই, প্রাতঃকৃত্য করি, তারপর আবার বোতাম টিপলে সে এসে ব্রেকফাস্ট দিয়ে যায়। ব্রেকফাস্ট সাধারণতঃ দুধ, রোল (রুটি), মাখন, জ্যাম্। সুইটজারল্যান্ডের দুধ খেতে এত সুন্দর, তার একটা নিজস্ব সুগন্ধ আছে যা অন্য কোনো দেশের দুধে নেই, তার রংটিও তার নিজস্ব। আর রোল শুকনো অথচ শক্ত নয় ; চিম্‌সে নয়, মুখে দিতে না দিতেই মিলিয়ে যায়, অনেকক্ষণ ধরে চিবোতে হয় না, জ্যাম না মাখালেও মিলিয়ে গিয়ে মিষ্টি লাগে। আর সুইটজারল্যান্ডের মাখনটিও খেতে এমন সুন্দর, পারী (Paris)র মাখনের মতো পান্‌সে নয়, লণ্ডনের মাখনের মতো নোন্‌তা নয়, যেন সজ্জপ্রস্তুত টাটকা জিনিস, কোটায় বন্দী বহুদূর থেকে আনীত নয়। সুইটজারল্যান্ডের হাওয়ার প্রভাবে বোধ হয় সব জিনিসই শুকতাপন্ন ; লণ্ডন পারীর হাওয়ার দোষে সব জিনিসই কতকটা সঁ‌য়াতস্‌য়াতে। তফাৎটা যেন ছোটনাগপুরের সঙ্গে বাংলাদেশের তফাৎ।

লণ্ডন থেকে সুইটজারল্যান্ডের পশ্চিমপ্রান্ত যেন কলকাতা থেকে কাশী। মাঝখানে ফরাসীদের দেশ ফ্রান্স। সুইটজারল্যান্ডে যেতে হলে পারী (Paris) হয়ে যেতে হয়, লণ্ডন থেকে পারী যাবার ছ’টো উপায় আছে,

একটা হচ্ছে ট্রেনে করে কিছুদূর স্টীমারে করে কিছুদূর এবং আবার ট্রেনে করে বাকীটা; আরেকটা হচ্ছে এরোপ্লেনে করে সমস্ত পথ। পারী থেকে বরাবর ট্রেন। ইউরোপটা যেন আমাদের ভারতবর্ষেরই মতো, আর ইংলণ্ড যেন আমাদের সিংহল। ভারতবর্ষের আসাম থেকে গুজরাটে যাওয়া আর ইউরোপের স্পেন থেকে সুইডেনে যাওয়া একই রকম ব্যাপার—কেবল মাঝে মাঝে শুষ্ক বিভাগের আমলারা এসে বাস্তব খুলে দেখে কোনো রকম মাণ্ডল দেবার মতন জিনিস লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কি না আর পাসপোর্ট পরীক্ষা করে দেখে বিদেশে ভ্রমণ করবার অনুমতি পেয়েছি কি না। এসব ব্যাপার বড় অপ্রীতিকর, একবার নয় দু'বার নয় চার বার এই হাঙ্গাম। আসাম থেকে গুজরাটে যেতে চাও তো আরামে যেতে পারো, কিন্তু স্পেন থেকে সুইডেনে যেতে চাইলে পাঁচ সাত বার পাসপোর্ট খুলে দেখাতে হবে, বাস্তব খুলে দেখাতে হবে! ঝকঝক! মাণ্ডল দেবার মতন জিনিস সব দেশে এক নয়, ইংলণ্ডে যা স্বচ্ছন্দে আনতে পারো ফ্রান্সে তা নিতে চাইলে মাণ্ডল দিতে হবে। সুইটজারল্যাণ্ডে যাবার সময় যে কামরাটায় যাচ্ছিলুম সেই কামরাটায় একজনের সঙ্গে কিছু সিগার ছিল, সে সুইস সীমাস্থ এসে সেগুলোর কিছু নিজের পকেটে কিছু আলাপীদের পকেটে কিছু মীটের নাচে কিছু 'বাস্ক'র উপরে চটপট সরিয়ে ফেললে। শুষ্ক বিভাগের আমলারা যখন এল তখন সে অগ্নান বদনে বললে, 'না,

আমার কাছে নিষিদ্ধ কিছু নেই;” তারা চলে গেলে আলাপীদের পকেট থেকে সিগারগুলি উদ্ধার করে তাদের এক একটি খাওয়ালে, আর খুব একচোট হেসে নিলে। ফ্রান্সের ইতালীর সুইটজারল্যান্ডের লোক খুব আলাপী ও মিশুক প্রকৃতির। ইংরেজরা ওদের মতো ট্রেনে উঠে বক্বক্ব করে না।

সুইটজারল্যান্ডে পৃথিবীর সব দেশের লোক হাওয়া বদলাতে যায়, যক্ষ্মা রোগ সারাতে যায়, বরফের উপর শী খেলতে স্কেট করতে যায়। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ বিদেশী গিয়ে সুইটজারল্যান্ডের হাজার হাজার হোটেল দখল করে বসে, তাদের দৌলতে সুইটজারল্যান্ডের মতো পাহাড়ী দেশের গরীব অধিবাসীরা বড় মানুষ হয়ে গেল। যেন সারা বৎসর মহোৎসব চলেছে, দীয়াতাং আর নীয়াতাং, টাকাং দীয়াতাং আর সেবাং নীয়াতাং।

ব্রেকফাস্টের পরে কী হয় তোমাদের তা বলিনি। ব্রেকফাস্টের তিন ঘণ্টা পরে লাঞ্চ (মধ্যাহ্ন ভোজন)। ততক্ষণ সবাই নিজের নিজের কাজে বা খেলায় লেগে যায়। বরফ ঢাকা রাস্তার ওপর দিয়ে কেউ বা যায় চাকাবিহীন “শ্লেজ্” গাড়ী পিছলিয়ে, কিংবা চাকাবিহীন “লুজ্”-পিঁড়ি পিছলিয়ে, রাস্তার একপাশ দিয়ে কেউ বা চলে স্নো-বুট পরা পায়ে হেঁটে। বরফ ঢাকা মাঠের ওপরে খেলা ভমে— মোচার খোলার মতো এক প্রকার সরঞ্জাম পায়ে বেঁধে শী*

* “Ski” কথাটার উচ্চারণ, “শী”।

খেলা, উল্টোপাল্টা ছুঁখানা খড়মের মতো একরকম সরঞ্জাম
পায়ে পরে স্কেট করা। আরো কত রকম খেলা আছে।
ইউরোপের খোকাখুকী থেকে বুড়োবুড়ি পর্যন্ত সবাই
খেলোয়াড়। আমার পঁসিগঁতে* দু'টি আমেরিকান মেয়ে
ছিল, ওরা একা একা আমেরিকা থেকে জাহাজে চড়ে
এসেছে, এসে ওদের মা'র সঙ্গে যোগ দিয়েছে, ওরা রোজ
যেত শী খেলতে বা স্কেট করতে, পুরুষের মতো খেলার
পোশাক পরে। শুধু আমেরিকান কেন, সব দেশের মানুষ
সুইটজারল্যান্ডে দেখা যায়। আমার পঁসিগঁতে যারা থাকৃত
তাদের সঙ্গে দেখা হতো লাঞ্চ খাবার ও ডিনার খাবার
ঘরে। ডিনার মানে রাত্রি ভোজন। তারপরেও কেউ
কেউ সাপার খায়, কিন্তু সাধারণের পক্ষে ডিনারই শেষ
খাওয়া। এক টেবিলে বসে অনেক জন মিলে লাঞ্চ বা
ডিনার খায়, নানা দেশের লোক, জার্মান ফরাসী ইংরেজ
ইতালীয়ান চেক্ হাঙ্গেরিয়ান ইত্যাদি। ভারতবর্ষের সব
প্রদেশের লোক কোনো দিন এক সঙ্গে খায় কি? তোমরা
কি তোমাদের স্বদেশবাসী কানাড়ী মলয়ালী সিন্ধী
নেপালীদের সঙ্গে বসে খেতে পাও! কিংবা তোমাদের
আপন প্রদেশের বেনে বাগ্দি নমঃশুদ্দের সঙ্গে সামাজিক
ভোজে যোগ দিতে পাও? ইউরোপের লোক এক হবার
যত সুযোগ পায় আমরা তত পাইনে।

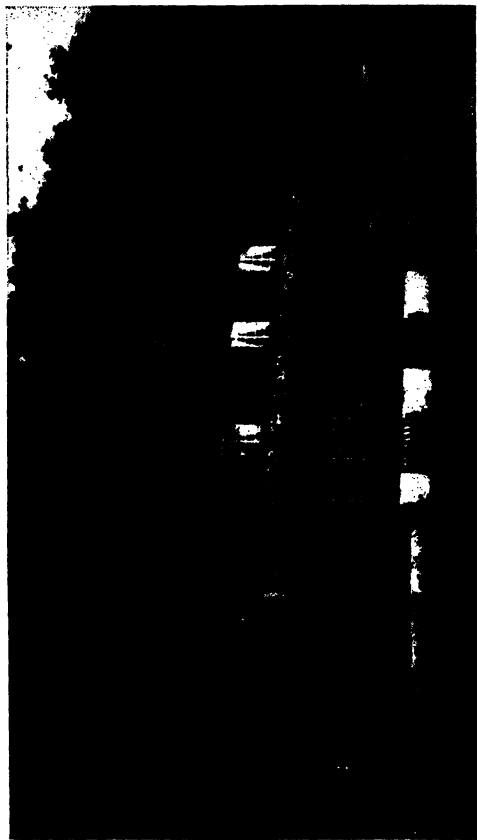
* "Pension" কথাটির উচ্চারণ, "পঁসিগঁ"। ওর মানে, একটু ঘরোয়া
ধরণের হোটেল।

লাঞ্চের পর আমরা পাহাড়ের উপর উঠে বনের ভিতর দিয়ে বরফের ওপর আছাড় খেতে খেতে অন্য গ্রামে বেড়িয়ে আস্তুম। আমি যে গ্রামটাতে ছিলুম সেটার নাম লেজ'্যা। ইউরোপের গ্রামগুলো শহরগুলোর চেয়েও আরামের। শহরের সব সুবিধাই গ্রামে আছে। বেড়াতে বেড়াতে তেঁষ্টা পেলো কাফেতে বসে কাফীর ফরমাস করো, কাফীতে চুমুক দিতে দিতে ছ'ঘণ্টা বসে থাকলেও কেউ কিছু বলবে না। কাফেটা হচ্ছে সাধারণ লোকের ক্লাবের মতো, সেখানে গিয়ে যতক্ষণ খুশি আড্ডা দাও, বই পড়ো, তাস খেলো, কাফীর জগ্গে ছ'চার আনা পয়সা ধরে দিলেই সাত খুন মাপ! চাবী মজুরেরাও দিনের কাজের শেষে খেয়ে দেয়ে কাফেতে গিয়ে মদের গ্রাস নিয়ে বসে, তাদের অবশ্য স্বতন্ত্র কাফে। ছাত্রেরা কাফেতে গিয়ে কাফীর পেয়ালার সামনে পাঠ্যপুস্তক খুলে বসে, তাদেরও তেমনি নিজেদের পৃষ্ঠপোষিত কাফে। কাফেতে নাচ গানও হয়।

এতক্ষণ তোমাদের শুধু খেলার দিকটা দেখিয়েছি, কাজের দিকটা দেখাইনি। দারুণ শীতের মধ্যেও মজুরেরা মাটি খুঁড়ছে, চাবারা চাষ করছে, দোকানীরা দোকান চালাচ্ছে। কাজের সময় অবিশ্রান্ত কাজ, খেলার সময় অবিশ্রান্ত খেলা। আমাদের সেই পঁাসিঅঁর দাসীটি ভোর থেকে মাঝ রাত অবধি কত রকমের কত খাটুনি যে খাটুত দেখে অবাক হয়ে যেতুম, অথচ তার মুখে কথা নেই, বিরক্তির চিহ্ন নেই, হাসি লেগে রয়েছে। লেজ'্যাতে



Fig. 1. (Leysin)



1179 (Chalet)

যক্ষ্মারোগীদের যে সব ক্লিনিক আছে সেগুলিতে যে সব রোগী তিন বছর একই ভঙ্গীতে শয্যাশায়ী ভাবে পড়ে আছে, তাদের দেখলে মনে হয় না যে তারা একটুও দুঃখিত বা চিন্তিত। জীবনটাকে খুব হাল্কা ভাবেই ওরা নিচ্ছে, যাবজ্জীবন সুখ জীবন। কয়েকটি ক্লিনিকে যক্ষ্মা রোগী ছেলেমেয়েরা শয্যাশায়ী। নানা দেশের ছেলেমেয়ে— ফিনল্যান্ড থেকে পর্তুগাল অবধি ইউরোপের মানচিত্রে যতগুলো দেশ দেখছি সব দেশের বালক বা বালিকা প্রতিনিধিরা সেখানে একজোটে হয়েছে, এদের দিয়ে নতুন ইউরোপ এক হয়ে গড়ে উঠেছে। সুইটজারল্যান্ডে রুগ্ন ছেলে মেয়েদের জন্যে আন্তর্জাতিক স্কুল আছে, সূর্যালোক ও মুক্ত বাতাসের মধ্যে তারা স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিছাও লাভ করে। ইউরোপের ইস্কুলগুলিতে লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজও শেখানো হয়, ড্রিল ইত্যাদি কসরও তো শেখানো হয়ই, গানের সাহায্যে বাজনার সাহায্যে নাচের সাহায্যে খুব লোভনীয় ভাবে শেখানো হয়। সেইজন্যে ইউরোপের ইস্কুলকে পাঠশালা বললে তার ঠিক পরিচয়টি দেওয়া হয় না, পাঠশালা তো বটেই নাটশালাও বটে, আবার কারু-শিল্পের কারখানাও বটে। ছেলেরা বাড়ীতে পড়ে না, যতটুকু পড়বার ততটুকু ইস্কুলে গিয়ে পড়ে। ছেলেরা তবেই মুখস্ত করবার যন্ত্র নয় যে সকাল ছপুর সন্ধ্যা কেবল ঐ কর্মই করবে! খেলাও ওদের একটা কর্ম, ওদের বয়সে খেলাটাই বরং মুখ্য পড়াটা হচ্ছে গৌণ।

সুইটজারল্যান্ড থেকে ফেরবার পথে একটি ইংরেজ বালকের সঙ্গে দেখা। সুইটজারল্যান্ডে শী খেলতে স্কেট করতে গিরেছিল, সুইটজারল্যান্ডটা হচ্ছে ইউরোপের play-ground, বিশেষতঃ শীতকালে। ডোভারে ট্রেনে ওঠবার পর তার সঙ্গে আলাপ। বললে, “চা খেয়েছেন? চা আনতে দেবো?” বললুম—“এই মাত্র খেয়ে এলুম, দণ্ডবাদ।” সে ট্রেনের দেয়ালের বোতান টিপতেই রেস্ট’রা কারের ওটোর এল, তাকে নিজের জন্ত চায়ের ফরমাস দিলে। ইতিমধ্যে এক ফরাসী যুবক এসে জিজ্ঞাসা করেছেন, “জায়গা হবে কি?” আমরা বলেছি, “ঠিক একটি জায়গা খালি আছে, আপনাকে নিয়ে আমরা তিনজন হবো!” ফরাসীটি এসে বস্বামাত্র তাঁকেও জিজ্ঞাসা করলে, “চা খেয়েছেন? আনতে দেবো?” তাঁর সম্মতি নিয়ে তার জন্তে চা আনতে দিলে, কিন্তু চা আর আসে না! নিজের চা’টা ভদ্রলোককে খেতে অমুরোধ করে সে একখানা বই খুলে পড়তে আরম্ভ করে দিলে। অনেক দেরিতে চা যখন এল তখন নিজের টোস্ট নিয়ে তাঁকে খাওয়ালে। তারপর তিন জন মিলে গল্প। ছেলেটি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে অনেক খবর জানতে চাইলে; জানালুম কিন্তু শেষকালে আমাকে বললে, “আপনি আমাকে নিরাশ করলেন, আমি ভেবেছিলাম আপনি যখন ভারতবর্ষের লোক তখন কিছু না হোক হুঁচারটে ভেঙ্কি ভোজবাজি বল্‌বা মাত্রই দেখাবেন। কিন্তু আপনি বলছেন ও সব কিছু জানেনই না; যদিও ইঙ্কুলে আমরা পড়েছি

আপনারা জানেন।” অগত্যা সে নিজেরই আমাকে একটা সস্তা বিলিতী মজলিসী খেলা শিখিয়ে দিলে, কাগজে কলমে নক্সা কেটে খেলতেহ য়। ফরাসীটিও দেশলাইয়ের ওপর দেশলাইয়ের কাটি সাজিয়ে কী একটা কৌশল শেখাতে বাচ্ছিলেন এমন সময়ে ট্রেন এসে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে থামল।

লণ্ডন, ২৩ ফাল্গুন ১৩১৪

আইল অফ্ ওয়াইট

ইংলণ্ডের দক্ষিণে এই যে দ্বীপটি এটি আমাদের যে কোনো মহকুমার চেয়েও বোধ হয় ছোট ; কিন্তু তোমাদের ক'জনই বা নিজের নিজের মহকুমা বা জেলা মোটামুটি রকম দেখেছ ? এরা কিন্তু এরোপ্লেনেও যেমন ওড়ে পায়েও তেমনি হাঁটে। আমি এই চিঠি লিখছি আর আমার কাছে একটি ছোকরা বসে আগুন পোহাতে পোহাতে বই পড়ছে ; সে লণ্ডন থেকে ব্রাইটন ৫২ মাইল ৮ ঘণ্টায় হেঁটে এসেছে, সে রাস্তাও আমাদের রাস্তার মতো সমতল নয়, পাহাড়ে। ব্রাইটন থেকে এখানে জাহাজে ক'রে আসা যায়, কিংবা রেল করে পোর্টস্মাথে এসে সেখান থেকে জাহাজে করে এখানে আসা যায়। আমি লণ্ডন থেকে পোর্টস্মাথ্ রেল এলুম, তারপর জাহাজে চড়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে এখানে পৌছলুম। এই দ্বীপটার আগাগোড়া রেল আছে, বাস আছে, জাহাজ আছে, ট্যাক্সি আছে, ঘোড়ার গাড়ী আছে, পায়ে হেঁটে সমস্ত দ্বীপটা দেখতেও বেশী সময় লাগে না। দ্বীপটাতে গোটা পাঁচ ছয় শহর আছে, সেখানে গ্রীষ্মকালে লোকে হাওয়া বদল করতে আসে। খুব ছোট ছোট শহর, কিন্তু চমৎকার পরিপাটী। রাস্তাঘাট ফিটফাট, বাড়ীঘর সারিবদ্ধ, দোকানে বাজারে ইংরেজমূলত শৃঙ্খলা, কোনো রকম হট্টগোল, কোনো রকম দরকষাকষি কোনো রকম

ফেলাছড়া নেই। মেজের ওপরে হাঁটু গেড়ে ইংরেজ মেয়ে মেজে-দেয়াল নিকিয়ে চক্চকে করছে, এমন দৃশ্য প্রতিদিন সকালবেলা দেখি। ঘরসাজানো জিনিসটি ইংরেজেরা যেমন বোঝে আমরা তেমন বুঝিনে। প্রত্যেকটি আসবাবের নির্দিষ্ট স্থান আছে, একস্থানে কিছুই জড় করা হয় না, নির্দিষ্ট স্থান থেকে কোনো জিনিস এক ইঞ্চি সরে না। যেমন ঘরে তেমনি বাইরে। আমাদের ভালো ছেলেরা আঙুলে কালি মেখে চুল ঝোড়োকাকের মতো করে জামার আস্তিন খোলা রেখে চটি ফট্‌ফট করতে করতে হাঁটেন, অথচ তাঁদের মা-বোনদের এদিকে নজর দেবার ফুরসৎ থাকে না এবং তাঁদের বাপখুড়োদের মতে এই তো সুবোধ ছেলের লক্ষণ। ছেলে আমার লেখাপড়া ছাড়া আর কিছুতে মন দেয় না, এ কি কম সৌভাগ্য? ইংরেজ ছেলেদের মায়েরা কিন্তু অতি অল্প বয়স থেকে ছেলেকে ফিটফাট হতে শেখান, সেই জন্তে হাতমুখ ধুয়ে মুছে মেজে ধবধবে তক্তকে রাখাটা ভালো ছেলের পক্ষে লজ্জার কথা নয়, চুলে চিরুনী দিয়ে ত্রাশ লাগিয়ে ভদ্রগোছের একটা অতি সাদাসিধে টেড়ী কাটা স্বয়ং পণ্ডিত মশাইয়েরও নিত্যকর্মের অঙ্গ এবং খুব অল্পদামের পোশাকও নিজের হাতে ঝেড়ে কেচে পরিষ্কার রাখা সম্ভব।

এই বাড়ীতে একটি ছোট ছেলে তার বাবার সঙ্গে এসেছে; তার বাবার সঙ্গে তার যে রকম সখ্যক তাকে আমরা বলতুম—“দোস্তি”। এরা যেন দুটি বন্ধু ইয়ার, পরস্পরের সঙ্গে ঠাট্টা করতে এদের একটুও বাধে না,

পরস্পরের সঙ্গে খেলা করা তো তবু ভালো, পরস্পরের সঙ্গে বক্সিং লড়াটাও মাঝে মাঝে চলে ! বাপ ছেলেকে “Wild flowers” নামক একখানা উদ্ভিদবিজ্ঞান বই উপহার দিয়ে তার ওপরে লিখেছেন “To Roy—Dad”। ছেলেটির নাম Roy. আমি এই চিঠি লিখছি, Roy পিয়ানো বাজাচ্ছে, তার বাবা এলেন। Roy বললে, “বাবা, তোমাকে কত খুঁজলুম, তুমি কোথায় গিয়েছিলে !” বাবা বললেন, “বাগানে ছিলুম।” ছেলে বাবার কাছে গিয়ে আনন্দে লাফ দিলে যেমন পোষা কুকুরে লাফায় ; তারপর আবার গিয়ে পিয়ানোয় বসল, তার বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন। তার বাবা তাকে কোনো বিষয়ে নিকরৎসাহিত করেন না। তার দস্তিপানায় তিনি তার সর্বপ্রধান সাথী, ছরস্তপনায় তিনিই তার ওস্তাদ।

সেদিন সকালবেলা আমি ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি, এমন সময় পেছন ফিরে দেখি একখানা ঘোড়ায়-টানা cart আসছে, আমাদের দেশের মোষে টানা গাড়ীর মতো মাল-বোঝাই। গাড়ীটা আমার কাছে এসে থামল। গাড়ীর চালক আমাকে বললে, “গাড়ীতে বসবেন ?” আমি বললুম, “বেশ তো।” তখন তার পাশে গিয়ে বসলুম। সে বললে, “কোথায় যাওয়া হচ্ছে ! Sandown ?” আমি বললুম, “কোথায় যাবো ঠিক না করে বেরিয়েছি—পথ আমাদের পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।” সে বললে, “আমুন তবে Sandown ঘুরে আসবেন, বেশি দূর না, লাঞ্চার আগেই ফিরতে পারবেন।” তারপরে যা ঘটল তার বিবরণ দিতে

বস্লে একখানা মহাভারত লেখা হয়ে যায়। সুতরাং সংক্ষেপে সারি। সে দিন বাসায় ফিরে লাঞ্চ খাওয়া তো ঘটলই না, বাসায় ফিরে চা খাওয়াও ঘটল না, এবং ডিনারের জন্তে ফিরতে দিতেও তার ইচ্ছা ছিল না। সে আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে লাঞ্চার সময় lobster খাওয়ালে, তার এক বন্ধুর বাড়ীতে চায়ের সময় কাঁকড়া খাওয়ালে এবং সারাদিন ধরে গাড়ীতে করে অনেক গ্রাম ও শহর তো দেখালেই, শেষকালে বাসায় এনে পৌঁছে দিলে। লোকটা হচ্ছে তার নিজের কথায় “fisherman by trade”, তার বয়স ৬৬ বৎসর, গায়ে ভীমের মতো জোর, বক্সিংএ নাকি এ দ্বীপের তার দোসর নেই। যুদ্ধের সময় submarine-এর ওপর নজর রাখবার জন্তে যেসব জাহাজ ছিল তাদের একটাতে সে কাজ করত। এই দ্বীপেই তার জন্ম, এইখানেই সে অধিকাংশ জীবন কাটিয়েছে এবং এখনো তার ইচ্ছা আছে নানা দেশ ঘুরে আসবে, India দেখে আসবে। সে জিজ্ঞাসা করলে, “India কত বড়? লণ্ডনের চেয়েও বড়!” তার জিওগ্রাফীর দৌড় লগুন অবধি।

তার সঙ্গে Sandown গেলুম। রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হয় সেই সেলাম করে। পাড়ারগাঁয়ের লোক নতুন লোক দেখলেই শ্রদ্ধা জানায়। সুইটজারল্যান্ডের চামারা রাস্তায় সেলাম করে বলেছে, “Bon jour, monsieur.” এখানকার গৌরো লোকেরাও দেখা হলেই বলে, “Good morning, Sir!” লণ্ডনের মতো শহর জায়গায় নতুন লোকের সম্মান

নেই, কারণ সেখানে তো নতুন লোকের ছড়াছড়ি। রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হয় টেরি তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয়, জুড়ে দিয়ে শেষকালে বলে—“এই ছেলেটি এ অঞ্চলে নতুন এসেছে, একে দেশ দেখাতে নিয়ে চলেছি।” টেরির ইচ্ছাটা এই যে আমি যেন জানি, টেরি এ দ্বীপের একটা মাতব্বর লোক, সকলে তাকে চেনে ও ভালোবাসে। “They all like me—don't they?” কথায় কথায় আমার ওপরে এই প্রশ্নবাণ। “They all know me—I am known all over the Island—am I not?” আমি অগত্যা বলি, “তা তো দেখছি।” তখন সে বলে, “When you go back to India, tell your father that you met Terry Kemp, the fisherman.” সে বেচারা জানে না যে India এখান থেকে আট হাজার মাইল দূরে, সে ভাবছে India বোধ হয় ফ্রান্সের মতো কাছাকাছি।

টেরির সঙ্গে সেদিন সমস্ত দিন বকেছি, কিন্তু ঐ একই কথা। “Isn't that a good pony?” আমি বলি, “Certainly,” “Isn't that a lovely dog?” “Oh, yes.” মোট কথা টেরির যা কিছু সমস্ত ভালো। তার ঘোড়ার মতো ঘোড়া এ দ্বীপে নেই, তার কুকুরের মতো কুকুর এ দ্বীপে নেই। তার বাড়ী নিয়ে গিয়ে দেখালে তার মোটর বোট, তার ছোট ছোট নৌকা, তার ভাড়া দেবার চেয়ার, তার মুরগীর পাল—তার সমস্ত কিছু নতুন লোকের দেখবার মতো এবং বাবাকে লেখবার মতো।

“Well, you like it. Then write that to your father.” আমার বাবার প্রতি তার এই আকর্ষণটা বড়ই অযাচিত। আমার বাবার বয়স কত, তাঁর ক’টি ছেলেমেয়ে, তিনি কবে ইংলণ্ড আসবেন, ইত্যাদি ঘরোয়া প্রশ্নের কথা তোমাদের নাই জানালুম। তোমরা শুধু জেনো, পাড়াগাঁয়ের লোক সব দেশেই সমান, সব দেশেই এদের স্নেহ মমতা বেশী, অতি সহজে এরা মানুষকে আপন করে নেয়, বিদেশী লোককে সাহায্য করতে পারলে এরা কৃতার্থ হয়ে যায়। তবে গ্রামের মধ্যে এরাই যে মাতব্বর লোক, এদের যা আছে আর কারো যে তা নেই, এ কথাটা এরা পদে পদে জানিয়ে রাখে এবং কেবল তুমি জানলে তবে না তোমার বংশসূক্তকে জানিয়ে দেওয়া চাই।

টেরির বাড়ী হয়ে Shanklin দেখতে এলুম। Shanklin বড় সুন্দর শহর। পাহাড় কেটে সমুদ্রের বাঁধ করা হয়েছে, যেন দেয়ালের মতো সোজা হয়ে উঠেছে। অনেক উঁচুতে বাঁধের ওপরে বড় বড় সব হোটেল কাফে সিনেমা নাচঘর। টেরি ওখান থেকে গাড়ী বোঝাই করে কাঁকড়া ও lobster সংগ্রহ করলে, ওসব সিদ্ধ করে অশ্রু বিক্রী করে মুনাফা পাবে। Shanklin থেকে ফেরবার সময় দৈবাৎ তিনটি ভারতীয় তরুণীর সঙ্গে দেখা। ভদ্রতার ধার না ধেরে টেরি করলে কি না, আমার মত না নিয়ে তাঁদের ডেকে বললে, “Ladies, here is a gentleman wishing to meet you.” আমি অগত্যা নেনে পড়ে

তাদের সঙ্গে ছ'একটা শিশু কথা বিনিময় করলুম। টেরিঙ্ক জ্বালায় শেষটা আমার দশা এমন হয়েছিল যে, মনে মনে বলতে লাগলুম, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। রাজ্যাসুদ্ধ সকলের সঙ্গে তার ভাব, সকলের সঙ্গে তার ঠাট্টা। এক তরুণ তার তরুণীকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে ফিরছে—টেরি তাকে বললে, “কি হে তুমি তোমার মেরীকে নিয়ে বেড়াচ্ছ বুঝি, আমাদেরও দিনকাল ছিল হে, আমাদেরও মেরী ছিল”—বুড়োর রসিকতায় তরুণীটির মুখ এমন রাঙা হয়ে উঠল আর তরুণটির হাসি এমন সঙ্কোচশূচক হলো যে, আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। অথচ এ ধরনের রসিকতা তো এই নতুন দেখলুম না, দেশেও দেখেছি পাড়া-গাঁয়। এটা তাজা মনের, সুস্থ মনের লক্ষণ। দোষের মধ্যে এটা একটু ভোঁতা, একটু স্থূল।

তারপরেও এ রকম রসিকতা পদে পদেই চলল। পথে তরুণী দেখলেই বুদ্ধের ঠাট্টা শুরু হয়। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, “এমন girls তোমার দেশে আছে?” কী আপদ্! আমি বলি, “হঁ।” এর পরে টেরিঙ্ক বাড়ী এসে lobster সিদ্ধ করলুম তার সঙ্গে মিলে। তার মতো লোকের বাড়ীতেও কলের উম্মন আছে, পয়সা ফেলেলেই গ্যাসের আগুন জ্বলে। ইউরোপের গরীব লোকেরাও খুব আরামে থাকে। তাদেরও স্বতন্ত্র বসবার ঘর, শোবার ঘর, রান্নাঘর, স্নানের ঘর—সাজ-সজ্জা বেশ ভালোই। তবে টেরিঙ্ক বাড়ীটা কিছু নোংরা ও এলোমেলো। কারণ টেরিঙ্ক বুড়ী মারা গেছে, ছেলে মারা

গেছে। টেরি কোথায় খায়, কোথায় শোয়, তার ঠিক থাকে না, সে মাছ-কাঁকড়া ধরে ও বিক্রী করে গ্রামে গ্রামে বেড়ায়।

Lobster সিদ্ধ করতে বেশ সময় লাগে! কতগুলো জ্যান্ত lobster ডেক্‌চীতে করে উষ্মনে চড়িয়ে দিয়ে আমরা চা খেতে বসলুম। Lobsterগুলো সিদ্ধ হলে পর জ্যান্ত কাঁকড়া সিদ্ধ করার পালা। সে গেল ঘোড়াকে hay ঘাস খাওয়াতে, আমি রইলুম কাঁকড়ার তত্ত্বির করতে। কাঁকড়াও সিদ্ধ করতে সময় লাগে অনেক। কাঁকড়াগুলো সঙ্গে নিয়ে ৬ লবস্টার খেয়ে আমরা বেকলুম সেন্ট হেলেন্স গ্রামের পথে রাষ্ট্রের অভিযুক্ত।

পথে এক কৃষকের বাড়ী থেমে দেখলুম কৃষক কোথায় গেছে, কেউ নেই বাড়ীতে। কৃষকের অনেকগুলি মুরগী আর গোরু আছে, আর তার পুকুরে অনেকগুলি হাঁস সাঁতার কাটছে। মুরগী এদেশে সব গ্রাম্যালোকেই রাখে, তাতে খরচ কম, লাভ অনেক। আর একজন কৃষকের বাড়ী গেলুম, সে গরীব বলে তাকে টেরি গোটাকয়েক কমলালেবু দিলে, দয়া করে নিজের ইচ্ছায়। তার ছেলেমেয়েগুলি ঘরের জানালার ওপার থেকে হাত নেড়ে আমাকে ভালোবাসা জানাতে লাগল। টেরি একটি ফুল তুলে এনে আমাকে পরিয়ে দিয়ে গাড়ী চালাতে যাচ্ছে এমন সময় একটা মোটর কার কোথেকে ছুটে এসে বেচারি নেলী কুকুরটিকে মাড়িয়ে দিয়ে গেল। সৌভাগ্যক্রমে নেলী প্রাণে মরল না, কিন্তু তার

মাথার এক জায়গা বিষম কেটে গেল। টেরি তো কিছুক্ষণ একেবারে থ' হয়ে রইল ; বেচারার রসিকতা গেল কোথায়, কুকুরটিকে তুলে নিয়ে ঐ কৃষকের বাড়ী রেখে এসে সারাটা পথ কাঁদো কাঁদো ভাবে বকতে লাগল, “আমার কত সাধের কুকুর, তাকে আমি ৫ পাউণ্ড দামেও বেচতে চাইনি, তাকে কি না মাড়িয়ে দিয়ে গেল ঐ bloody মোটরকার ! ইচ্ছা করলে কি থামতে পারত না ? ড্রাইভার ব্যাটার কি চোখ নেহ ? মজা বের করে দিচ্ছি রোসো। আমি চিনেছি ঐ ড্রাইভারটা কে।”—তারপর ওর নামধাম বংশপরিচয় দেওয়া চলল আর মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হতে লাগল, “ইচ্ছা করলেই সে থামতে পারত। না ?” আমার মনটাও বিশ্বাস হয়ে গেছিল। নেলীটি বড় নিরীহ কুকুর, বেচারি গাড়ীর আগে আগে সারাদিন ছুটেছে, চোখের সামনে কিনা তার এই দশা ঘটল। ভাবলুম, মানুষ কত সহজে বাঁধা পড়ে। যে মানুষের স্ত্রী মরেছে, ছেলে মরেছে, সে একটা কুকুরকে ছাড়তে পারে না, এত মমতা।

সমস্ত পথ টেরি মন খারাপ করে রইল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, “তোমাকে একটা লব্‌স্টার দিয়েছিলুম বাসায় নিয়ে গিয়ে সকলকে দেখিয়ে খেতে, আনতে ভুলে যাওনি তো সেটা ?” আমি বললুম “সেটা একটি ছোট ছেলেকে দিয়ে দিয়েছি।” “দিয়ে দিয়েছ—? তোমাকে খেতে দিলুম শখ করে আর তুমি করলে বিতরণ ! নাম করো দেখি কোন ছেলেটাকে দিয়েছ, দেখে নেবো একবার তাকে।” আমি

ভয়ে ভয়ে বললুম, “আহা, রাগ করছ কেন ? তোমার এমন সুন্দর লব্‌স্টার একলা আমি খেলে কি ভালো হতো, অনেক জন খেয়ে তোমার সুখ্যাতি করবে এ কি তুমি চাও না ?” কিন্তু যুক্তিটা তার মনঃপূত হলো না—গোঁয়ো যোগীকে ভিখ্ দিতে তার ইচ্ছা ছিল না। কিম্বা সেট দিত, আমি দেবার কে ? ভাবটা বুঝে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, “হাঁ, টেরি, তুমি কোন Club এ যাও ?” টেরি উল্টোটা বুঝলে। বললে “কী বলছ ? আমি crab রাঁধতে জানি কি না ? আচ্ছা তোমাকে একটা crab (কঁকড়া) dress করে খাওয়াচ্ছি, দাঁড়াও।”

তখন এক মাঝির বাড়ী আমরা থামলুম। মাঝি তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে চায়ের টেবিলে বসেছিল, আমাকে বসিয়ে চা খাওয়ালে। মাঝির সাত ছেলে দুই মেয়ে—স্ত্রী নেই। ছেলেগুলি মাঝির নিজের কাছে মাঝিগিরির এপ্রটিস্। তারা খাসা ছেলে, বেশ ভূষায় ভদ্র ঘরের ছেলের মতন, লেখাপড়া জানে, খবরের কাগজ পড়ে। ছোট খুকীটি বড় লাজুক, তাকে আমি কিছুতেই কথা কওয়াতে পার্‌লুম না। সকলের খাওয়া হয়ে গেছে, তার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তবু সে লজ্জায় খাচ্ছে না ; শেষে আমি তার দিকে না তাকিয়ে মাঝির সঙ্গে কথা জুড় দিলুম, তখন খুকী তার চা-টুকু লুকিয়ে এক চুমুকে শেষ করে দিলে।

এতক্ষণ টেরি বসে কঁকড়া dress করছিল। Dress করা কঁকড়া এনে আমার সামনে রেখে বললে, “খাও।”

সর্বনাশ! তার বাড়ীতে সে আমাকে পেট ভরে খাইয়েছে, শুধু চাই খাইয়েছে পাঁচ পেয়লা, যদিও চা আমি কদাচ খাই। এই আমার ভাগ্য যে, টেরি আমাকে কিছুতেই সিগারেট ঝাওয়াতে পারেনি এবং মদ সে নিজেই খায় না। আগে নাকি খেত, তারপরে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বড় বেশী সিগারেট খায়। তাকে এক বাস সিগারেট কিনে দিলুম। আর দেশলাই তার কিছুতেই জ্বোটে না। রাস্তায় একে তাকে থামিয়ে তাদের দেশলাই চেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরায়। লোকটা দিব্যি ছ'পয়সা রোজগার করে, তার বিশখানা আন্দাজ নৌকা আছে, শ'খানেক চেয়ার ভাড়া দেয়, কেউ নেই যে কাকুর পেছনে খরচ করবে—তবু তার হাতে টাকা নেই, এমন দিন গেছে যেদিন তার হাতে এক পেনীও ছিল না। আসল কথা লোকটা তার যন্ত্রপাতির যত্ন নেয়, পাঁচ বারের পুরোনো নৌকাকেও নতুনের মতো করে রেখেছে, তার পেনী ঘোড়াগুলোর পেছনে খরচ যত করে তাদের কাছ থেকে কাজ পায় না তত।

রাইড, ১৮ই চৈত্র ১৩৩৪

ছেলেমেয়েদের থিয়েটার

“Children’s Theatre” নামে লণ্ডনে একটি ছোট থিয়েটার আছে, কাল গিয়েছিলুম তার অভিনয় দেখতে। থিয়েটারটি লণ্ডনের Shaftesbury Avenueতে, ঐ রাস্তাটায় আরো অনেক থিয়েটার আছে, বড় বড় নামজাদা থিয়েটার। এই অঞ্চলটাকে বলা হয় London’s Theatre-land অর্থাৎ লণ্ডন শহরের থিয়েটার পাড়া। কেবল থিয়েটার কেন, আরো অনেক রকম আমোদ প্রমোদের আয়োজন এই অঞ্চলে আছে, বড় বড় সিনেমা, নাচঘর, আর্ট গ্যালারী, মিউজিয়াম, হোটেল, রেস্টুরাঁ, স্পাইমিং বাথ্‌সবই এর কাছাকাছি।

আমাদের “Children’s Theatre”টি ঠিক Avenueর ওপরে নয়, একটি গলির ভিতরে। প্রবেশ করবা মাত্র চোখে পড়ে। ঘরটি ছোট, শ’খানেকের বেশী সীট নেই, সব সীট স্টেজের সামনের মেজেতে। লণ্ডনের বড় বড় থিয়েটার-গুলোতে তলে ওপরে মিলিয়ে বসবার কায়দা অনেক রকম, বসবার মঞ্চ চার পাঁচ তলা। তাদের বলে সার্কল্‌, স্টল, পিট্‌, ব্যাল্কনী, গ্যালারী ইত্যাদি। টিকিট কেনবার সময় ফাস্ট সেকেণ্ড থার্ড ক্লাস বললে টিকিট পাবে না, বলতে হবে “ড্রেস সার্কল্‌” বা “গ্যান্‌ফিথিয়েটার স্টল্‌” বা এমনি কোনো কথা। কিন্তু “Children’s Theatre”এ ওসব বালাই নেই, ওখানে গিয়ে বলতে হয় আমি এত খরচ করতে রাজি, এই দামের

একখানা টিকিট দিন্। তখন যিনি টিকিট বিক্রী করেন তিনি সেই দামের টিকিট না থাকলে তার চেয়ে একটু বেশী দামের টিকিট কিন্তে পারো কিনা জিজ্ঞাসা করেন ও আপত্তি না থাকলে দেন। টিকিট নিয়ে যেই ভিতরে ঢুকলে অমনি তোমাকে একজন কর্মচারিণী তোমার টিকিটের গায়ে লেখা সীটে নিয়ে বসিয়ে দিগ্নেন ও তুমি ছই পেনী দাম দিলে একখানা প্রোগ্রাম দিলেন। বলতে ভুলে গেছি টিকিটের দাম বড়দের পক্ষে ছয় পেনী থেকে পৌনে ছয় শিলিং অবধি (অর্থাৎ পাঁচ আনা থেকে সাড়ে তিন টাকা অবধি), ছোটদের পক্ষে তার অর্ধেক।

আমার সীটে গিয়ে বসলুম। এ পাশ ও পাশ চেয়ে দেখি বুড়োবুড়ীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, ছেলেমেয়ে আর বুড়োবুড়ী যেন দশ আনা ছয় আনা। তোমরা ভাবছ ছোটদের খিয়েটারে বড়রা কী দেখতে যায়। বড়রা দেখতে যায় ছোটদের আনন্দ। এতগুলি ছোট ছেলে মেয়েতে মিলে যখন মুছ কণ্ঠে কলরব করছিল, বারবার উঠছিল বসছিল, নিজের সীট ছেড়ে পরের সীটে যাচ্ছিল, ও শেষের সারিতে যারা ছিল তারা সীটের ওপর দাঁড়িয়ে দেখছিল—তখন তাদের সেই উন্নয়ন চঞ্চল ভাব বড়দের কত আনন্দ দিচ্ছিল তা কি তারা জানত? মেরী যখন তার সীট ছেড়ে আগের সারির একটা রিজার্ভ সীট দখল করে বসল তখন পেছন থেকে তার বাবা ডাকলেন—“মেরী!” মেরী কি শুন্ল? মেরীর তখন কত আশ্রয়! কিন্তু রিজার্ভ সীটে

କାହିଁକି ମାଲିକାନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀୟ





ছোট মেয়েদের 'থিয়েটার'—রাজা আনুজ্জু

যখন এক পঞ্চাশ বছরের ঠাকুমা এসে বসলেন তখন বেচারি মেরীকে পুনর্মুখিক হতেই হলো।

এই থিয়েটারটি যেন একটি ঘরোয়া ব্যাপার। অরকেষ্টা ছিল না, ছিল একটি পিয়ানো। যিনি পিয়ানোতে বসেছিলেন তিনি বাজাতে বাজাতে যখন থামেন তখন তাঁর একটু দূরে বসে থাকা খোকাখুকুদের আদর করেন। সেটজটিও ছোট্ট দর্শকদের খুবই কাছে, যাঁরা অভিনয় করছিলেন তাঁরা যেন দর্শকদেরই দলের লোক, তাঁদের সঙ্গে আমাদের নিকট সম্বন্ধ। যাঁর বইয়ের অভিনয় হচ্ছিল তিনিও অভিনয়ে নেমেছিলেন, তাঁর নাম Margaret Carter. অভিনেতা অভিনেত্রীদের বয়স বেশী নয়, সংখ্যাও অল্প। সব সুদ্ধ নয় জ্ঞান অভিনয় করেছিলেন।

এই থিয়েটারটি যাঁরা চালান তাঁরা ঠিক শখের খাতিরে চালান না, ঠিক লাভের খাতিরেও না। তাঁরা একটি বন্ধু মণ্ডলী—তাঁরা একটি সুন্দর আইডিয়া নিয়ে কাজে নেমেছেন, ছোটদের একটা বড় অভাব দূর করেছেন, একটি স্থায়ী থিয়েটারের অভাব। প্রত্যেক ইঙ্কুলে মাঝে মাঝে যে রকম থিয়েটার হয় তাতে ভালো অভিনয় সব সময় দেখা যায় না, তাতে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁদের অগ্র কাজ আছে, তাঁরা অভিনয় কার্যে সমস্ত প্রাণ মন ঢেলে দিতে পারেন না। কিন্তু এই থিয়েটারটিতে যাঁরা আছেন তাঁরা সব কাজ ছেড়ে এই কাজে নিপুণ হচ্ছেন, তাঁদের কেউ বা বই লেখেন, কেউ বা প্রোডিউস করেন, কেউ সৌন্স আঁকেন, কেউ আসবাব

তৈরী করেন, কেউ পোশাক তৈরী করে দেন। অনুষ্ঠানটির সেক্রেটারী হচ্ছেন Margaret Carter, তিনি লেখনও ভালো। স্কুলগুলির সঙ্গে এঁদের বন্দোবস্ত আছে, এঁরা স্কুলের ছেলেমেয়েদের দলবলকে সম্ভায় থিয়েটার দেখান।

কাল কী কী অভিনয় হলো বলি এবার। প্রথমে “আল্ফ্রেড ও পোড়া পিঠে” নামক সেই ইতিহাসের গল্পটা। অনেক শত বছর আগে রাজা আল্ফ্রেড তাঁর প্রজাদের সুখ দুঃখ চোখে দেখবার জন্মে ছদ্মবেশে বেড়াতে বেড়াতে এক পল্লী গ্রহিণীর গৃহে বিশ্রাম করেন। সেই গৃহের উন্মূলের ধারে কয়েকটি পিঠে রেখে গ্রহিণীর অল্পবয়সী দাসীটি খেলা করতে বেরিয়ে যায়। অতিথির অমনোযোগ বশত পিঠেগুলি পুড়ে যায়, গন্ধ পেয়ে গ্রহিণী ছুটে এসে দেখেন দাসী নেই, পিঠেগুলি পুড়েছে। অতিথিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি মেয়েটির দোষ নিজের ওপরে টেনে নিয়ে বলেন, “একটা বিশেষ কাজে আমিই মেয়েটিকে বাইরে পাঠিয়েছি। আমারি দোষ।” তখন গ্রহিণী ভীষণ চটে বললেন, “তবে তার বদলে তুমিই বেত খাও।” এই বলে যেই তাঁকে মারা অমনি রাজার অনুচর এসে পড়ে বলল, “করছ কী? ইনি যে রাজা!” তারপর গ্রহিণী জামু পেতে মাপ চাইলেন, রাজা হেসে ক্ষমা করলেন এই শর্তে যে দাসীটিকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন, তাঁর একজন সভাসদের সঙ্গে তার ভালোবাসা আছে তিনি জেনেছেন, তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন। দাসীটি উচ্চ বংশের মেয়ে, ভাগ্যদোষে দাসী হয়েছিল।

যে মেয়েটি বালিকা দাসী সেজেছিল তার বয়স বেশী নয়, চমৎকার অভিনয় করলে। রাজা আলফ্রেডের পোশাক সেকালের মতো গাম্ভীর্যময় হয়েছিল। সবচেয়ে ভালো হয়েছিল পল্লী-গৃহিণীর গৃহিণীপনা, যেমন তাঁর গলার জোর তেমনি তাঁর গায়ের জোর, যেমনি তিনি কড়া তেমনি তিনি বাস্তব। অণ্ড সকলে অভিনয়ই করছিল, তিনি সত্যি সত্যি রায়বাঘিনীগিরি করছিলেন। একেই বলে সেরা অভিনয়।

এর পরে একটি গীতাভিনয়। ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার বেকার হয়ে ঘরে বসে আছে। একটি সুন্দরী মেয়ে নাচতে নাচতে এসে বললে, “Soldier, Soldier, won't you marry me?” সৈনিক উত্তর দিলে, “তোমার মতো সুন্দরীকে বিয়ে করব, আমার জুতো নেই যে!” মেয়েটি নাচতে নাচতে জুতো কিনতে গেল। আরেকটি সুন্দরী মেয়ে নাচতে নাচতে এসে বললে, “Solider, solider, won't you marry me?” সৈনিক উত্তর দিলে, “তোমার মতো মেয়েকে বিয়ে করব, আমার কোট নেই যে!” সে মেয়েটিও নাচতে নাচতে কোট কিনতে বেরিয়ে গেল। প্রথম মেয়েটি জুতো এনে দিয়ে বললে, “Soldier, soldier, won't you marry me?” সৈনিক উত্তর দিলে, “আমার টুপী নেই যে!” মেয়েটি টুপী আনতে গেল। দ্বিতীয় মেয়েটি কোট এনে দিয়ে বললে, “Soldier, soldier, won't you marry me?” সৈনিক বললে, “আমার দস্তানা নেই যে!” সে মেয়েটি দস্তানা আনতে গেল। প্রথম মেয়েটি টুপী এনে পরিয়ে দিলে।

দ্বিতীয় মেয়েটি দস্তানা এনে পরিয়ে দিলে। ছ'জনেই বললে, "Soldier, soldier, won't you marry me?" সৈনিকের এবার চেহারা ফিরে গেছে। সে লাফ দিয়ে উঠে বললে, "তোমাদের এখন কেমন করে আমি বিয়ে করি? আমার যে বৌ আছে, ছেলে আছে!" তখন একধার থেকে টুপীর পরে টান, আরেক ধার থেকে দস্তানার পরে টান, এক ধার থেকে জুতোর পরে, আরেক ধার থেকে কোটের পরে। নিধিরাম হাঁ করে চেয়ে রইল, তারপর গিয়ে নিজের আসনটিতে বসে পড়ল, মেয়ে দুটি চলে গেল জুতো টুপী কোট দস্তানা নিয়ে নাচতে নাচতে।

এর পরে আরেকটি গীতাভিনয়—একটি প্রাচীন ছড়াকে দৃশ্যে পরিণত করা হয়েছে। একজন সেজেছিল জ্যাকেট, আরেকজন পেটিকোট। তাদের দড়ি দিয়ে রোদে ঝুলিয়ে দেওয়া হোল, কুয়োর ফেলে দিলে, উদ্ধার করে আবার ঝুলিয়ে রাখলে। তারপরে A. A. Milne-এর লেখা একটি কবিতার মূকাভিনয়—"The knight whose armour didn't squeak." ছই নাইটের জন্তে দুটি কাঠের ঘোড়া দেখা গিয়েছিল স্টেজে। একটি দম দেওয়া কলের ঘোড়া ও ঘোড়-সওয়ার স্টেজের এপাশ থেকে ওপাশ দৌড় দিয়েছিল। তারপরে ছ'টি Sea Chantey অর্থাৎ জাহাজের নাবিকের গান গাওয়া হোল। বলতে ভুলে গেছি, স্টেজে যখন গীতাভিনয় বা গান ইত্যাদি হতে থাকে তখন স্টেজের নীচে পিয়ানো বাদ্ধান হচ্ছিল।

এর পরে একটা খুব চমৎকার গীতাভিনয় হলো। বার্বারী উপকূলের জলদস্যুদের জাহাজের সঙ্গে ইংরেজদের জাহাজের লড়াই। বার্বারীদের জাহাজটা গোলা খেয়ে ডুবে ও জলদস্যুরা ডুবে মরবার সময় খুব অঙ্গভঙ্গী সহকারে ঘট করে মরল। দর্শকরা তো প্রত্যেক অভিনয়ের শেষে ঘন ঘন করতালি দিচ্ছিলই, এই অভিনয়টার শেষে অনেকক্ষণ ধরে করতালি দিয়ে শেষাংশটুকু আরেক বার অভিনয় করিয়ে তবে ছাড়লে। বার্বারী জলদস্যুরা উত্তর আফ্রিকার মুর, তাদের কানে বড় বড় ring, তাদের গায়ের রঙ কালো।

এর পরে একটা “Mime play” অর্থাৎ মূকাভিনয়। তিন বোনের এক খুড়ী তাদের পড়াতে এলেন, পড়াতে পড়াতে তুলতে লাগলেন, এই অবসরে তাদের বাড়ীর ছে'করা সহিসের (Stable boy) সঙ্গে তারা নাচতে শুরু করে দিলে। বাগানের যেখানটায় তারা নাচছিল সেখানে একটা মূর্তি ছিল, সেই মূর্তির নাম অনুসারে নাটকটার নাম হয়েছে “The Statue.” যা লেগে statueটার একাংশ ভেঙে যায়, তা দেখে নাচ তো গেল থেমে, ভয়ে সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। খুড়ীর যখন ঘুম ভাঙল তখন তিনি দেখেন তিন ভাইঝি কাকে যেন আড়াল করছে, তিনি উঠে গিয়ে যার কাছে দাঁড়ান তারি পিছনে কে একজন লুকোয়, কিছুতেই ধরতে না পেরে তিনি আবার এসে একটু ঝিমুলেন। এই অবসরে মেয়ে তিনটি সেই ছেলেটাকে নিয়ে মূর্তির জায়গায় মূর্তির মতো ত্রিভঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে দিলে, খুড়ী

চোখ চেয়ে যেই তার কাছে যান অমনি সে বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়, যেই ফিরে আসেন অমনি সোজা হয়ে দাঁড়ায়, অবশেষে খুড়ীর কেমন যেন সন্দেহ হলো মূর্তিটা কি জ্যান্ত ? সাহস করে তিনি যেই তার গায়ে হাত ছুঁইয়েছেন, অমনি সে শিউরে উঠে বললে “হঁ।” তখন ভূতের ভয়ে খুড়ীর মূর্ত্তা হয় আর কি।

এদের সকলেরই অভিনয় এমন হয়েছিল যে কথা না বলেও এঁরা অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যের দ্বারা গল্পটির কিছুই বোঝাতে বাকী রাখেননি। এঁদের পোশাক গত শতাব্দীর ধরণের—বেশ ঢিলেঢালা। নাচটাও হয়েছিল সেকালের মতো আয়েসপূর্ণ, একালের মতো তাড়াহুড়াময় নয়। নাচের বাজনা (পিয়ানো) নামজাদা সঙ্গীতকারদের সুরে বাজছিল—Brahms, Debussy, Chopin, Tschaikowsky. আজকালকার jazz bandএর মতো নয়। ছোটবেলা থেকে উচুদরের সঙ্গীতের সঙ্গে ও নাচের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে এঁরা শিশুদের রুচিকে ভালো দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন।

সবশেষে সবচেয়ে সফল অভিনয় Margaret Carterএর নাটিকা “The Dutch Doll” অর্থাৎ “হল্যান্ড দেশের পুতুল।” সান্ উঠতেই দেখা গেল একটা বুড়ে হ্যাঁচ—চো করে হাঁচল। তার বুড়ী এসে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, “এখন থেকে তিন বেলা খেতে দিতে পারব না, দু বেলা খেতে হবে, আমরা বড় গরীব হয়ে পড়েছি।” তাদের মেয়ে তাদের কাছে বিদায় নিতে এল, সে এক অভিনেত্রীর কাছে চাকুরি

পেয়েছে, তার আশা সেও একদিন অভিনেত্রী হয়ে উঠবে। তাকে বিদায় দেবার সময় বুড়োবুড়ী কেঁদে ফেললে, সে তাদের সাস্থনা দিয়ে খুশি মনে বিদায় হলো। একটু পরে একখানা চিঠি এল, বুড়োর আত্মীয় লিখেছে, “আমি তোমার মেয়েটিকে দেখতে যাচ্ছি, যে কোনো মুহূর্তে পৌছতে পারি, দেখব মেয়েটি লক্ষ্মী কি না, রাঁধতে বাড়তে জানে কি না, আমার ছেলের উপযুক্ত কি না।” বুড়ো বললে, “সর্বনাশ, মেয়ে তো চলে গেল, আর মেয়ে তো রাঁধা বাড়ার ক—খ—গ জানে না, তার মন কেবল নাচ গানে।” বুড়ী বললে, “একটা বুদ্ধি এঁটেছি। যাও, ঐ ঘর থেকে ঐ পুতুলটাকে নিয়ে এসো, ওটাকেই মেয়ে বলে চালাতে হবে। তোমার আত্মীয় তো তোমার চেয়েও বুড়ো, চোখে দেখতে পায় না ভালো, কানে শুন্তে পায় না ভালো, আজকের মতো ওকে রাতের আবছায়াতে ভোলাতে পারা যাবে।”

একথা বলতে বলতে দরজায় ঘা পড়ল। কে এল? এল—আত্মীয় নয়, তার ছেলে! বুড়ো তো তাকে বসিয়ে খাতির করছে, বুড়ী লেগে গেছে পুতুলটাকে নাড়িয়ে ধুইয়ে কাপড় পরাতে। শেষে পুতুলটাকে এনে এক কোণে দাঁড় করানো হলো, পুতুলটা কলের পুতুল, তার পিছনে দাঁড়িয়ে দড়ি টানলে সে হাত পা নাড়ে, “হাঁ” “না” বলে ও নাচে। ছেলে যেই তার সঙ্গে করমর্দন করতে গেছে তার হাত ধরেছে জাপটে। যেই জিজ্ঞাসা করেছে, “কেমন আছেন?” উত্তর দিয়েছে “না।” টেবিলে খেতে বসে পুতুলটা কেবলি দুই

হাত মুখে তুলছে ও নামাচ্ছে দেখে বুড়ো যেই দড়িটাকে আরেক রকম করে টেনেছে অমনি সে ছই হাত ঘুরিয়ে লাগিয়েছে পাশের লোককে ছই চড়। চড় খেয়ে ছেলেটা গেল ক্ষেপে। বুড়ো দেখলে ব্যাপার ভালো নয়, দড়িতে টান দিতেই পুতুল লাগল নাচতে, ছেলেটা দেখে এত খুশি হলো যে তখনি বলে ফেললে, “আমি একে বিয়ে করবই।” বুড়ী পুতুলটাকে ঘুম পাড়াতে নিয়ে যাবার সময় ছেলেটা বিয়ে পাগলার মতো ছুটতে চায় তার সঙ্গে, বুড়ো তাকে অনেক কষ্টে সে রাত্রের মতো বিদায় করে পর দিন আসতে বললে। কিন্তু রাত না পোহাতেই সে এসে দ্বারে দিয়েছে ধাক্কা। ইত্যবসরে বুড়োর মেয়ে ফিরে এসেছে নিরাশ হয়ে, অভিনেত্রী তাকে বলেছে, “অভিনয় শিখতে চাও তো আগে রান্না করা বাসনমাজা প্র্যাক্টিস্ করো, তারপর স্টেজে নামবে।” বেচারী ওবিঘ্না জানে না, নাচগানের দিকে তার ঝোঁক, তাই সে রাগ করে ফিরে এল। তারপর সেই ছেলের সঙ্গে সকালবেলা তার দেখা। ছেলে বললে, “কাল তুমি কী সুন্দর নাচলে। তুমি আমার বৌ হলে তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না।” মেয়েটি তো ভারি খুশি হয়ে বিয়ে করতে রাজি হোলো! বুড়োবুড়ীর ভারি আনন্দ। চার জনে মিলে খুব এক চোট নেচে নিলে। ছেলেটি বললে, “দেখ, কাল আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল তুমি মানুষ নয়, পুতুল।” মেয়েটি বললে, “এতে আর সন্দেহ কী? মেয়েমানুষ মাত্রই পুতুল থাকে, যতদিন না তাকে কেউ বিয়ে করে মানুষ করে দেয়।”—

খুব সুন্দর গল্প, খুব সুন্দর অভিনয়। গৃহসজ্জা বড় খাসা হয়েছিল, ঠিক একটি গরীবের কুঁড়ের মতো, দরজা জানালা সত্যিকারের। এদিক থেকে ইউরোপের থিয়েটারগুলি আমাদের তুলনায় অশেষ উন্নতি করেছে, স্টেজের ওপরে সব রকম দৃশ্য দেখানো হয়ে থাকে। পারীতে (Paris) আর্ম সমুদ্র সাঁতার, জাহাঞ্জে ডুব, কামানের গোলার আগুন ইত্যাদি সত্যিকারের মতো দেখেছিলাম একবার। “Children’s Theatre”এ অবশ্য অত আয়োজন সম্ভব নয়, ওসবের খরচ উঠবে না। তা ছাড়া ছোটদের কল্পনাশক্তি বড়দের চেয়ে ঢের প্রখর, তারা স্টেজের ওপরে অত কিছু না দেখলেও কল্পনায় দেখতে পারে; তাদের কল্পনাশক্তিকে সঙ্গায় রাখতে হলে যত কম আয়োজন করা যায় তত ভালো।

যাঁরা কাল অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা শুধু অভিনেতা অভিনেত্রী নন, ম্যানেজার ও প্রোডিউসার। স্মরণ্য এঁদের কত খাটতে হয় আন্দাজ করতে পারো। সকলেরই অতিরিক্ত খাটুনি আছে। তাছাড়া সকলেরই ঘর সংসারের দায়িত্ব আছে। অল্পবয়সের মেয়ে এখন থেকেই অভিনয়ে দক্ষ হচ্ছে ও নিজের জীবিকা অর্জন করছে, এমনটি আমাদের দেশে হবার জো নেই। কাল যেসব খোকা-খুকীরা অভিনয় দেখে ফিরুল তাদের কেউ কেউ একটু বড় হয়ে অভিনেতা অভিনেত্রী হয়ে উঠবে, Ellen Terry যেমন আট বছর বয়স থেকে অভিনেত্রী হয়েছিলেন। এদেশে বাপ-মা-ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকেই এক একজন অভিনেতা-

অভিনেত্রী, এমনও দেখা যায় ; যেমন Forbes-Robertson পরিবার। নাচ করা, অভিনয় করা, গান করা, বাজনা বাজানো, এদেশে খুব প্রশংসার কাজ এবং তাই অনেকের জীবিকা। আমাদের দেশে একটি ভদ্রঘরের মেয়ে কেবল বেহালা বাজিয়ে টাকা রোজগার করছে এমনটি দেখা যায় কি ? এখানে তেমন মেয়ে অনেক। অনেক মেয়ে বায়োস্কোপের অভিনেত্রী হতে ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা পায়, অনেক মেয়ে থিয়েটারে ঢোকে। তাদের কত সম্মান !

লণ্ডন, ১৩৩৫

জার্মেনী—সারল্যাণ্ড

বুস্ (Bous) বলে জার্মেনীর একটি গ্রাম, হাজার পাঁচেক লোকের বাসস্থান। কাছেই সার নদী। নামে নদী বটে, আসলে খাল। তবু এতে ছোট ছোট জাহাজ যাওয়া আসা করে। নদীর ধারে মাঝারি গোছের নানা রকম ফ্যাক্টরী, অধিকাংশই লোহার। লোহা একটু দূর থেকে—আলসাস্ লোরেন্ থেকে আসে। কয়লা এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়। কারখানাগুলো আপাতত কিছুকাল ফরাসীদের দখলে। যুদ্ধের পরে এই অঞ্চলটা ফরাসীরা কিছুকালের জন্তে ভোগ করছে।

তা জার্মানরা যে মুখ শুকিয়ে মরে রয়েছে এমন নয়। তারা ভীমের মতো খাটছে এবং খাটুনির ফাঁকে গান বাজনায়ে মশগুল হচ্ছে। এই ছোট গ্রামটিতে যেসব লোক থাকে তারা অধিকাংশই মজুর। তারা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতি দল ৮ ঘণ্টা করে কারখানার কাজ করে। রাত দিন ২৪ ঘণ্টা কারখানার কাজ চলেছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দলের দ্বারা। সকাল ছ'টায় যারা কাজ করতে যায় তারা বেলা দুটোয় ফেরে। তার পরে অল্প একটা দল কাজে যায়। রাত দশটার সময় আবার দল বদল হয়। কারখানা থেকে ফিরে এরা কী করে বলতে পারো? এরা বাড়ীর কাছে লেগে যায়। নিজের নিজের বাড়ী এরা নিজেরাই তৈরি

করেছে। সে সব বাড়ী তৈরি করবার সময় অবশ্য মুনিসিপালিটীর সাহায্য পায়।

বাড়ীগুলি কত সুন্দর, কত বড় ও কত সাজানো গোছানো তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না, আমি নিজের চোখে বিশ্বাস করতে পারছি। ইংলণ্ডের মজুরদেরও এমন বাড়ী নেই। আমি এই গ্রামে ডাক্তারের বাড়ীতে আছি। ডাক্তারের আয় মজুরদের চেয়ে অল্পই বেশী। তবু আমাদের দেশের গ্রামা ডাক্তারের সঙ্গে তুলনা না করে গ্রাম্য জমিদারের সঙ্গে তুলনা করলেও লজ্জিত হতে হয়।

সুন্দর একটি বাড়ী, তার সঙ্গে একটি বাগান। বাগানে বাড়ীর মালিক সারাক্ষণ কাজ করেন। সত্তর বছর বয়সের বুড়ো, এখন তাঁর প্র্যাকটিস্ তাঁর জামাইকে দিয়েছেন, জামাইও ডাক্তার। বুড়োর বড় ছেলে কাছের গ্রামের এক ফ্যাক্টরীর কতী, বয়স বেশী নয়, যোগ্যতার জোরে পদোন্নতি করেছেন। ছোট ছেলের বয়স বারো চোদ্দ, কাছের গ্রামের এক Gymnasiumএ পড়ছে, লেখাপড়ায় ভালো নয় বলে বুড়ো নিজেই তাকে সাহায্য করেন। কিন্তু চালাক ছেলে, মজবুৎ গড়ন, নানা বিষয়ে চোখ কান খোলা রেখেছে, বড় হলে কোনো একটা বিষয়ে বিচক্ষণ হবেই। হবার উপায়ও আছে। কেননা আমাদের মতো এদের পরিবার বৃহৎ নয়, এবং পরিবারের ভার এদের বইতে হয় না। Ernst যা ইচ্ছা তাই পড়তে পারে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারে এবং যত দেরিতে ইচ্ছা তত দেরিতে বিয়ে করতে পারে। বিয়ে

করলেও ভয় নেই, কেননা এদেশের বোঁদের পিতৃদত্ত সম্পত্তি যদি না থাকে তো নিজের হাত-পা থাকে ; তারা সংসারের আয় বাড়াবার হাজারো সুযোগ পায়।

এদের বাড়ীর আগাগোড়া আর্টিষ্টিক। জানালা দরজা দেয়াল আসবাব বিছানা আলো যেদিকে চোখ পড়ে সেদিকে দেখি রঙের বৈচিত্র্য, গড়নের কারুকার্য, সূচীশিল্পের নিদর্শন। প্রত্যেকটি ঘরের দেয়াল ভিন্ন ভিন্ন রঙের। এটি লেখবার পড়বার ঘর। এটির দেয়ালের রঙ বাসি রঙের মতো লাল। দরজার সাইজ অস্বাভাবিক বড়, গড়ন সাদাসিধে, রঙ সবুজ। দরজায় ঠেলা দিলে দেয়ালে ঢুকে যায় ; সীলিং শাদা। জানালা সবুজ। পর্দায় ছবি। দেয়ালে খান কয়েক পুরোনো ছবির প্রতিলিপি, খান কয়েক নতুন ছবি, এই বংশের এক তরুণ শিল্পীর আঁকা। একটি আলমারিতে কিছু জার্মান ও ফ্রেঞ্চ বই, নানা দেশের বইয়ের অনুবাদ। রবিবাবুর ফরাসী “ফাল্গুনী” ও জার্মান “ক্ষুধিত পাষণ” আছে। উপরের ঘরে জার্মান “ভগবদ্গীতা” দেখেছিলুম। কোঁচ এবং সোফাগুলির ছবি এদের নিজেদের ফরমায়েসে আঁকা, টেবিলক্লথ ও পর্দা এদের নিজেদেরই বোনা। “এদের” মানে Ernst-এর মা’র ও দিদির।

একটা ঘরের মোটামুটি বর্ণনা দিলুম, অগ্ণাত ঘরের প্রত্যেকেরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেকেরই একটি গ্রাণ আছে, প্রত্যেকেরই সাজসজ্জা ভিন্ন রকম। আসবাবপত্র প্রাচীন ও আধুনিক, ছবিগুলি বাছা বাছা, মেজে-দেয়াল-

সীলিং সর্বত্র বাড়ীর লোকের আর্টিস্টিক রুচি-রীতির ছাপ। দেয়ালে এই যে রঙ দেখছি এ রঙ ওয়াল-পেপারের নয়। ইংলণ্ডের বাড়ীগুলোতে ওয়াল-পেপারের ছড়াছড়ি, তাতে একই রকম ছাপানো design. এদের মেজেতে কার্পেট না দিয়ে এরা ভালোই করেছে। পালিশ করা কাঠের মেজে নিখুঁৎ ভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা ঢের সহজ।

এরা অত্যন্ত সঙ্গীতভক্ত। পিয়ানো ছাড়া অন্যান্য বাতায়ন্ত্রও রাখে। প্রত্যেকেই গাইতে বাজাতে পারে। পরিবারের সকলেই এক সঙ্গে খায়, এক সঙ্গে গায়, এক সঙ্গে বাজায়, এক সঙ্গে খেলা করে। বয়স্ক ছেলের সঙ্গে বড়ো বাপ-মার প্রাণখোলা হাসি ঠাট্টা আমাদের দেশে দেখতে পাইনে। আমাদের ঠাকুরদা ও নাতি যেমন প্রাণ খুলে মিশতে পারে এদের বাপ ছেলেও তেমনি।

জার্মান জাতটাই সঙ্গীতভক্ত। কারখানার মজুরদের বাড়ীতেও বাতায়ন্ত্র আছে, তারা সময় পেলেই সঙ্গীত চর্চা করে। পরশু আমি গিয়েছিলুম এক দর্জীর বাড়ী। দর্জীর ছেলে বেহালা শোনালে। আর একটি মেয়ে দিলে একটি ফুলের তোড়া উপহার। এদের জাতীয় সমৃদ্ধি যুদ্ধের দ্বারা ধ্বংস হয়নি। কেননা, যুদ্ধের দ্বারা এদের কর্মঠ প্রকৃতি ধ্বংস হয়নি। যখন যাকে দেখি তখন সেই কিছু না কিছু কাজ করছে। রেল বেড়াবার সময় মেয়েরা সেলাই করছে, কথা বলবার সময় বাড়ীর গিন্নী সেলাই করছেন, রান্না করবার সময় বাড়ীর ঝি খবরের কাগজ পড়ছে, কারখানার মজুরনী

টিফিনের ছুটিতে ষ্টোভে রান্না চড়িয়ে কঠিন বৈজ্ঞানিক বই পড়ছে। অথচ খেলাধুলারও কম্মতি নেই, ছোটরা তো আমাদের দেশের মতো কত রকম খেলাধুলায় লেগে আছেই, বড়দের জন্মে টেনিস ফুটবল ইত্যাদি ছাড়া একটা প্রকাণ্ড সুইমিং বাথ আছে, ম্যুনিসিপালিটির দ্বারা তৈরি। তাতে প্রতিদিন পালা করে মেয়েরা ও পুরুষেরা সাঁতার কাটে এবং তার একটা অংশ ছোটদের জন্মে অগভীর করে গড়া।

সেদিন সেই দর্জীর ছেলেদের আসতে বলা হয়েছিল আমাদের এখানে। কাল সন্ধ্যার পরে তারা আমাদের surprise দেবার জন্মে কখন এক সময় এসে বাগানে বাজনা শুরু করে দিয়েছে—বেহালা আর Zither. শেখোক্ত যন্ত্রটাতে অনেকগুলো তার, দুই হাতের দশ আঙুলে বাজাতে হয়। অনেকক্ষণ বাজনা চলল, মাঝে মাঝে বাড়ীর লোকেরা গান ধরলেন তার সঙ্গে। বাড়ীর ঝিরাও এসে কতাঁ গিল্লীর কাছে চেয়ার নিয়ে বসল এবং সকলের সঙ্গে গেলাস ছুঁইয়ে সরবৎ পান করলে। মদ না বলে সরবৎ বললুম এই জন্মে যে, তাতে alcohol ছিল না এবং তা বাড়ীতেই তৈরি। কাল রাত্রে গান বাজনার মজলিসে আমরা বয়সে ও পদমর্যাদায় ছোট বড় সবাই ছিলাম—Ernst চোদ্দ বছর বয়সের ছেলে; কেবল Hermann ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার বয়স চার পাঁচ বছর, সে বুড়োর মেয়ের ছেলে।

পরিবারের সকলে মিলে যখন রাইনল্যাণ্ডের স্থানীয় সঙ্গীত গাইছিল তখন আমার বড় রোমান্টিক লাগছিল।

বাজনাও চলছিল তার সঙ্গে মোহ মিশিয়ে এবং সরবৎ খাওয়া চলছিল তার সঙ্গে ঘোর লাগিয়ে। বৃহৎ বাগানের বড় বড় গাছগুলোর উপরে তারা ভরা আকাশ ঝুঁকে পড়েছিল। কেবল দূর থেকে আসছিল ফ্যাক্টরীগুলোর আওয়াজ। গানবাজনার শেষের দিকে আমরা যখন শুতে গেলুম তখন অল্পবয়সী বিরা নিজেদের মধ্যে একটু নাচলে আব তাদের আত্মীয় সেই দর্জীর ছেলেরা নাচের বাজনা বাজালে। নাচের আনন্দ থেকে আমাদের দেশ বঞ্চিত। কিন্তু এরা ছেলে বুড়ো ছোটলোক বড়লোক সবাই নাচতে জানে, গাইতে জানে, বাজাতে জানে। রাত্রে খাওয়া শেষ হলে একটা-কিছু আমোদ করা এসব দেশের পারিবারিক কর্তব্য। গান এদের পক্ষে তেমনি সহজ পাখীর পক্ষে যেমন। রেল চড়ে ভিন্ গাঁয়ের মজুরেরা ফিরছে, তাদের সেই 4th class এর কামরা থেকে গানবাজনার ধ্বনি আসছে। Ernst আর তার মা বাড়ী ফিরছেন, দু'জনে মিলে হাল্কা সুরের গান ধরেছেন। মা'র বয়স ষাট, কিন্তু দিব্যি জোয়ান আছেন দেহে মনে।

আমার ধারণা ছিল জার্মানরা বড় গুরু-গম্ভীর জাত। কিন্তু দেখছি যুদ্ধে হেরে তাদের ফুঁতি বেড়ে গেছে। তাদের দেখে কে বলবে এরা ধনে-প্রাণে অনেক লোকসান দিয়েছে, এখনো এদের ভয়ানক দেনা, এখনো এই সার অঞ্চলটা পরাধীন ও এর কারখানাগুলো ফরাসীরা দখল করে বসেছে? হাসি সকলের মুখে লেগেই আছে, বিশেষ করে যে সব

বুড়োবুড়ীর ছেলে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে ও টাকা যুদ্ধে উড়ে গেছে সেই সব বুড়োবুড়ীর হাসি দেখে অবাক হতে হয়! এই বাড়ীতে ফরাসীরা আড্ডা গেড়েছিল। এই বুড়োর অনেক টাকা যুদ্ধে লোকসান গেছে।

আজ এক ছাপাখানায় গিয়েছিলুম। বিরাট ছাপাখানা। রঙীন বিজ্ঞাপন ও সিগারেটের বাক্স ইত্যাদি সব দেশের জন্তে তারা ছেপে দেয়। ছাপাখানার যারা মালিক তারা হাইস্কুলেও পড়েছে, অথচ তাদের অধীনে শ'ত্বেক মেয়ে খাটছে। পুরুষ সে কারখানায় অল্পই দেখলুম। বড় বড় কলগুলো অল্পবয়সী মেয়েরাই চালাচ্ছে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। জার্মান মেয়েদের ও পুরুষদের মুখ গোল ও নিটোল। মেয়েদের অনেকের কবরী আছে, অনেকের চুল ছোট করে কাটা। আর পুরুষদের অধিকাংশেরই মাথা মুড়ানো, কেবল কপালের উপরে ছ'এক ইঞ্চি জায়গা চুলের জন্তে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—সেই এক গোছা চুলে অতি অপরূপ টেড়ী। দেখলে মনে হয় লেস-বাঁধা ফুট বল! কিংবা কাকাত্যার মাথায় ঝুঁটি!

এখানে মোটরগাড়ী সংখ্যাভীত। তবু গোরুর গাড়ীও দেখছি। সেসব গাড়ীর কোনো কোনোটার গাড়োয়ান মেয়েমানুষ। ক্ষেতের কাজও মেয়েমানুষে করে। তা বলে তাদের ঘরকন্নার কাজ আকাশের পরীরা করে দিয়ে যায় না, কিংবা পুরুষ মানুষে করে না, তারা নিজেরাই করে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে রান্না হয়, তাই বেশী সময় লাগে না।

ফ্যাক্টরী খাঁট দিয়ে যে সব আবর্জনা জড় করা হয়

সেগুলো দিয়ে গোটা কয়েক কৃত্রিম পাহাড় তৈরি হচ্ছে, তার উপরে চারা গাছ পুঁতে জঙ্গল তৈরি হচ্ছে। এক আশ্চর্য দৃশ্য! আবর্জনাপূর্ণ গাড়ী চলেছে পাহাড়ের উপরে লটানো তার বেয়ে, বিছাতের সাহায্যে। আবর্জনা উজাড় করে তার বেয়ে আপনিই নেমে আসছে। এই নকল পাহাড় জঙ্গলগুলো দেখলে সত্যিকারের মনে হবে আর বছর কয়েক পরে।

মিউনিসিপালিটি থেকে যে স্কুল করা হয়েছে তাতে অন্তত ষোলোটি বছর প্রত্যেক ছেলেকেই পড়তে হয়, হোক না কেন সে রাজার ছেলে। তেরো চোদ্দ বছর বয়স অবধি এই স্কুলে বিনা পয়সায় পড়তে পারা যায়। Gymnasium এ পড়তে পয়সা লাগে। সেটা একটু উচ্চের স্কুল। স্কুলের বাড়ী বড়, সাজ সরঞ্জাম অশেষ রকম।

মিউনিসিপালিটি থেকে একটা বাড়ী বানিয়ে দিয়েছে, তাতে Nunরা থাকে। আর থাকে সেই সব বুড়োবুড়ীরা যাদের আশ্রয় নেই। এই সব Nunরা পরের ছেলে আগলায়, পরের বাড়ী গিয়ে শুক্রাষা করে আসে, এবং গ্রামের মেয়েদের রান্না সেলাই ও লেখা পড়া শেখায়। আর যেসব বুড়োবুড়ীরা তাদের আশ্রয়ে থাকে তাদের সেবা করে। এসব দেশে পিতামাতাকে পালন করা সন্তানের কর্তব্য নয়। পিতামাতার যদি সঞ্চয় না থাকে বা pension কম হয় তো তাদের দুর্দশা মোচন করে সমাজ। আমাদের দেশে এমনি সব আশ্রম হওয়া উচিত, সেখানে বিধবারা ভার নেবেন অনাথ শিশু ও নিরাশ্রয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার।

একটি মজুর পরিবারে গিয়েছিলুম। অল্প কয়েকটি নিখুঁৎ ভাবে পরিচ্ছন্ন ঘর, তাতে অল্প কয়েকটি নিখুঁৎ ভাবে সাজানো আসবাব, সমস্তই বাড়ীর গিন্নীর কীর্তি। একটি রান্নাঘর—খাবার ঘর—ভাঁড়ার ঘর। একটি মা-বাবার ঘর। একটি খোকা খুকির ঘর। রান্না—খাবার—ভাঁড়ার ঘরে একটি কাবার্ডে আলাদা আলাদা এক সাইজের চক্চকে ঝক্‌ঝকে পাত্রে চিনি, চা, মাখন ইত্যাদির নাম লেখা। অগ্ন্যাগ্ন জিনিস সম্বন্ধে তেমনি সুবাবস্থা; দরকারের সময় কোনো জিনিস খুঁজে নিতে এক সেকেন্ডও লাগে না। শোবার ঘরের বিছানা ধবধবে, পুরু, রাজভোগ্য। হেলেনদের ঘরে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বিছানা—তেমনি আরামের। আমি যখন গিয়েছিলুম তখন মজুর কারখানা থেকে ফিরে বাগানের মাটি কোপাচ্ছিল, শাকসবজীর জন্তে তাকে বাজারে যেতে হয় না। মজুরনী বাড়ীর কাজ করছিল। তারা বাড়ীর কাজ করে ফুরসৎ পেলে সেলাই করে। ইংলণ্ডের চেয়ে জার্মানীর মজুরদের অবস্থা ভালো। যাদের বাড়ী গিয়েছিলুম তারা গরীব মজুর। অগ্ন্যাগ্ন মজুরদের বাড়ী আরো বড়, বাইরে থেকে দেখতে আরো সুন্দর!

এবার আমাদের এই বাড়ীর কথা বলে শেষ করি। এদের সঙ্গে আমার এমন আত্মীয়তা হয়ে গেছে যে ঠিক বাড়ীর মতো লাগছে। সকলেই যেন 'আপনার লোক—কতী, গিন্নীর, তাঁদের মেয়ে, তাঁদের জামাই, তাঁদের ছেলে, তাঁদের নাতি, তাঁদের কুকুর। প্রথম প্রথম কুকুরটা আমার কাছে ছাড়া আর কোথাও যেতে না, তার তাতে একটা স্বার্থও

ছিল, কেননা আমার পকেট তখন বিস্কুটে ভরা ছিল। এখন কুকুর মশাইয়ের টিকিটিও দেখিনে, কিন্তু কুকুরের মালিক শ্রীমান্‌ এয়ার্নস্ট্‌ (Ernst) কুকুরের স্থান গ্রহণ করেছেন। ছ'জনে মিলে ছুঁছুঁমি করে বেড়াচ্ছি। সে জানে ছ'একটা ইংরেজী শব্দ, আমি জানি ছ'একটা জার্মান শব্দ, আর ছ'জনে জানি অল্প সল্প ফরাসী। তার দিদি খাসা ইংরেজী ও ফরাসী জানেন, সাহিত্য চিত্রকলা ও সঙ্গীতের সমঝদার। বাপের বাড়ীর পাশাপাশি তাঁর বাড়ী। যুদ্ধের সময় এঁরা সকলেই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কেউ যোদ্ধারূপে, কেই যুদ্ধ-ডাক্তাররূপে, কেউ যুদ্ধ-নাসরূপে। কাছেই যুদ্ধ হচ্ছিল, অনবরত গোলা পড়ছিল, অনেক বাড়ী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, আবার নতুন করে তৈরি হয়েছে।

Ernstএর ছ'খানা ঘর, বেশ বড় বড়। একটাতে সে শোয়, আর একটাতে পড়ে। পড়বার ঘরে তার গ্লোব, গ্রামোফোন, এয়ার গান্‌, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ক্লক্‌ঘড়ি, ক্যামেরা, ডাক টিকিট সংগ্রহের খাতা ইত্যাদি অনেক জিনিস থাকে। শোবার ঘরে তার আলনা দেরাজ মুখ ধোবার বাসন ইত্যাদি। কুকুটারটাও তার ঘরেই শোয়।

বুড়োবুড়ীর বসবার ঘরে একটা প্রাচীন কাঠের ক্লক্‌ ঘড়ি আছে, সেটাতে যখন একটা বাজে তখন একবার ও যখন বারোটা বাজে তখন বারো বার একটা কাঠের কুকু দরজা খুলে কুক্‌-উ করে ডাকে, ডাকা শেষ হলে দরজা বন্ধ করে গা-ঢাকা দেয়।

আজ ছোটো কারখানা দেখতে গিয়েছিলুম। লোহার কারখানাটায় হাজার তিনেক মজুর খাটে, নিরেট লোহাকে আগুনে গরম করে কলে পুরে ফাঁপা করে পিঁপে বানানো হয়, গোটা দশেক কলের ভিতর দিয়ে লোহাখানাকে ক্রমান্বয়ে চালায়। ভারি চমৎকার লাগছিল, যদিও পুড়ে মরবার ভয় ছিল পদে পদে। কাঁচের কারখানায় মজুর ও মজুরনী মিলিয়ে শ'তিনচার খাটে, কাঁচ গালিয়ে কারুকর্মময় মদের গেলাস, আতরের শিশি, আলোর ঝাড় ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। খুব অল্পবয়সী ছেলেরা কাজে লেগেছে, কারুর স্বাস্থ্য ভালো নয়, কিন্তু গরীবের ছেলে, রোজগার না করলে চলবে না। তা বলে ভেবো না তারা ছুটির সময় লেখাপড়া করে না কিংবা চিরকাল মুখ থেকে যায়। তাদের মাইনে মাসে পঞ্চাশ টাকা থেকে দেড়শো টাকা। তাদের উপরে অপরের ভার নেই, কেননা বাড়ীর সকলেই রোজগার করে,—বাবা ফ্যাক্টরীতে, মা ক্ষেতে, ভাইবোন ফ্যাক্টরীতে বা ক্ষেতে। এমন কি বুড়োবুড়ীরাও চুপ করে বসে মালা জপে না। আজ এক থুথুড়ে বুড়ী পায়ে হেঁটে রাস্তায় বেড়াবার সময় ছুঁচ স্মৃতি দিয়ে জামা বুনতে বুনতে চলেছিল।

এয়ান্স্ট আর আমি পাহাড়ে উঠেছিলুম—সত্যিকারের পাহাড়ে। পা পিছলে আলুর দম হবার ভয়ে বুট খুলতে হলো, খুব উঁচু না হলেও খুব খাড়া পাহাড়। একটা গুহা দেখলুম, ওখান থেকে ছেলেরা নিচের ছেলেদের উপরে নকল বোমা ফেলে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলত। যুদ্ধের সময় এই অঞ্চলে

এরোপ্লেন থেকে শত্রুরা বোমা ফেলে অনেক কিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল। তখন মেয়েরা মাটির নিচে গুহা করে লুকোতো আর সুযোগ পেলেই উপরে উঠে যুদ্ধে-যাওয়া ছেনেদের জায়গায় ফ্যাক্টরী চালাতো।

এখানকার মজুরদের বাড়ীগুলোর প্রত্যেকটার স্বতন্ত্র ডিজাইন, দেখে আনন্দ হলো। ইংলণ্ডে এক একটা পাড়ার সব বাড়ী একই রকম দেখতে।

বুস, সারব্রুকেন (জার্মেনী) ১৩৩৫

জার্মেনী—রাইনল্যাণ্ড

আমি এখন রাইন নদীতে জাহাজে করে যাচ্ছি। রাইন নদী সুইটজারল্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে জার্মেনীর ভিতর দিয়ে হল্যাণ্ডে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। এই নদীটির জন্তে দেশে দেশে রেষারেষি খুনোখুনি বড় অল্প হয়নি। ফ্রান্স বলে, “আমি এই নদী নেবো,” জার্মেনী বলে, “খবরদার।” রাইনের সেদিকে ক্রম্বেপ নেই, সে আপন মনে আল্পস পর্বতের বাতী নর্থ সাঁর কাছে পৌঁছে দেবার জন্তে অবিশ্রান্ত ছুটেছে। যে পথ দিয়ে সে ছুটেছে সে পথে ছোট বড় অনেকগুলি শহর দাঁড়িয়ে গেছে, তারা দু’ধারে দাঁড়িয়ে দেখছে তার চলা। সব চেয়ে বড় শহরটির নাম কোলোন। সেইখান থেকে আজ রেল চড়ে Bonnএ এলুম, বন থেকে জাহাজ ধরলুম। উজানে চলেছি, বন থেকে Bingenএ। জাহাজটা যাবে Mainz অবধি। এই সমস্ত অঞ্চলকে বলে রাইনল্যাণ্ড। এখনো রাইনল্যাণ্ডে ফরাসী ইংরেজ ও বেল্জিয়ান সৈন্ত আছে, ট্রিয়ারের এক গির্জা দেখতে গিয়ে সেই গির্জার বুড়ীর কাছে গুলুম। ট্রিয়ার অতি প্রাচীন শহর, জার্মেনীর প্রাচীনতম। রোমানরা সেই শহরে দুর্গ প্রভৃতি তৈরি করেছিল, এখনো ভগ্নাবশেষ আছে। রোমানদের ভাঙা amphitheatre

দেখে তখনকার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হয়। আমাদেরি মতো তারা খোলা জায়গায় “যাত্রা” অভিনয় করত, দর্শকরা বসত স্টেজকে ঘিরে বৃত্তাকারে।

এখানকার ট্রিয়ার শহরে মধ্যযুগের ক্যাথলিক গির্জাটি একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য। ক্যাথলিকরা ইউরোপের হিন্দু অর্থাৎ পৌত্তলিক। তাদের গির্জার সর্বত্র সাধু ও সাধ্বীদের স্মৃতিমিত মূর্তি ও স্মৃতিচিত্রিত জীবন-কাহিনী। ঘণ্টা বাজছে, প্রদীপ মিটমিট করছে, ভক্তেরা জানুপাত-পূর্বক ইষ্টমূর্তির কাছে মনস্কামনা জানাচ্ছে। ধূপধূনার গন্ধও পাওয়া যায়। হিঁদুয়ানীর সমস্তই আছে, কেবল পাণ্ডা-পূজারীর হট্টগোলটুকু নেই। গির্জাগুলোর চূড়া সংকীর্ণ ততে হতে আকাশে মিশে গেছে, কোনো কোনোটা ছ’শো তিনশো বছর ধরে তৈরি, দেখলে শ্রদ্ধা হয়।

ট্রিয়ার শহর মোজেল নদীর কূলে। মোজেল নদী Koblenz শহরে রাইন নদীর সঙ্গে মিলেছে। Koblenz-এর এক দিকে Bingen ও Mainz, অন্য দিকে Bonn ও Cologne. আমি ট্রিয়ার থেকে কোলোনে গিয়েছিলুম রেল। রেল চলে নদীর ধারে ধারে, প্রথমে মোজেল নদীর ধারে, পরে রাইন নদীর ধারে। রেলের এক দিকে নদী, অন্য দিকে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে ড্রাক্সার (vine) চাষ। তা থেকে মদ প্রস্তুত হয়। রাইনল্যান্ড মদের জন্যে বিখ্যাত। ছ’রকম মদ এদেশের লোকে খায়—রাইন মদ ও মেজেল মদ। তা ছাড়া বিয়ার অবশ্য

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পানীয়। কোনো একটা রেস্টুরাঁতে গিয়ে জল চাইলে মুশকিলে পড়তে হয়, কেননা জল কেউ খায় না বলে কেউ রাখে না। খাবারের সঙ্গে এরা হাল্কা মদ খায়—বিয়ার কিম্বা মোজেল্-মদ কিম্বা রাইন-মদ। জল চাইলে সোডা ওয়াটার এনে হাজির করে, lemon squash গোছের কিছু আনতে বলতে হয়। যে রকম সরবৎ বুস্-গ্রামে খেয়েছিলুম সে রকম সরবৎ আপেল ফল থেকে ঘরে তৈরি করা। কাজেই হোটেলে সে জিনিস মেলে না।

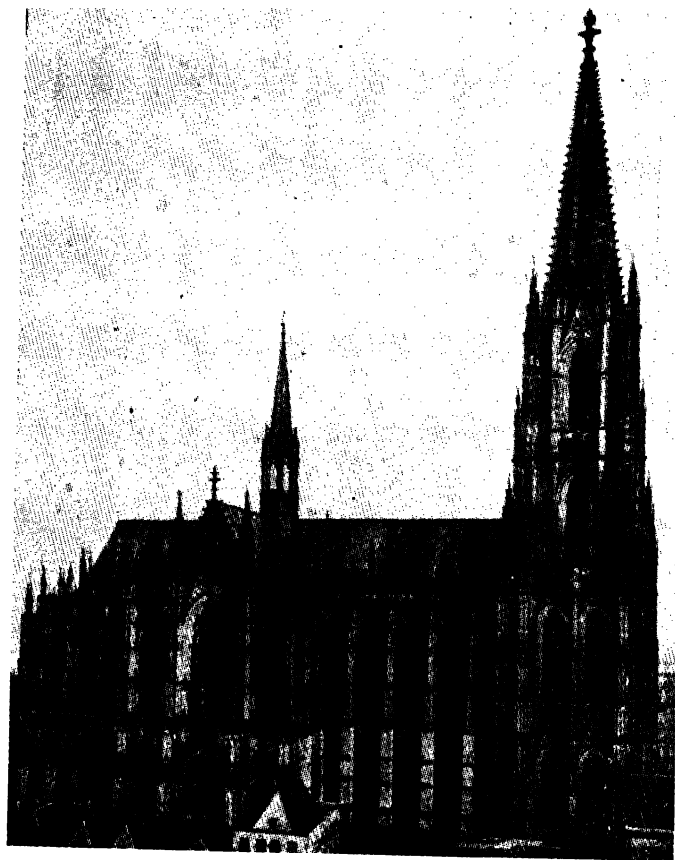
কোলোনের গির্জা ইউরোপের একটি নামজাদা গির্জা। সেটি ছাড়া আরো অনেক পুরানো গির্জা কোলোনে আছে। ক্যাথলিকরা যে কেমন সৌন্দর্যপ্রিয় তাদের গির্জায় গেলে তার পরিচয় পাই। গির্জাকে আশ্রয় করে ইউরোপের সঙ্গীত ও চিত্রকলা অভিব্যক্ত হয়েছে। গির্জার সমবেত সঙ্গীত ও সমবেত উপাসনা খ্রীষ্টানকে যেমন ঐক্য দিয়েছে, হিন্দু তেমন ঐক্য কোনো কালে পায়নি।

কোলোনেও রোমান যুগের ধ্বংসাবশেষ আছে। সেটিও একটি প্রাচীন শহর। কিন্তু প্রাচীন হয়েও সেটি চির-আধুনিক। প্রতিদিন তার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। এখন আন্তর্জাতিক প্রেস্ প্রদর্শনীর জগ্গে একটি উপনগর তৈরি হয়েছে। সমগ্র উপনগরটি জুড়ে আন্তর্জাতিক প্রেস্ প্রদর্শনী বসে। তা দেখতে পৃথিবীর সব দেশের লোক আসে। প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষের মাত্র ছ'চারখানা সংবাদপত্র

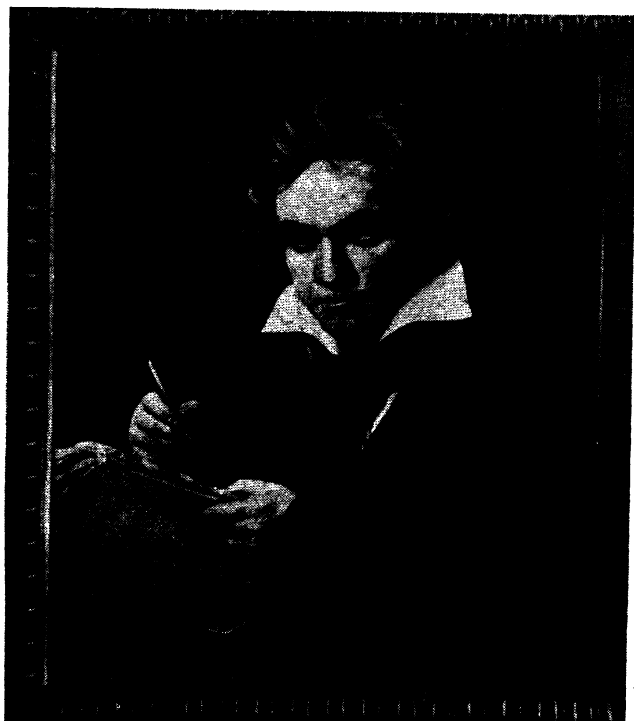
দেখলুম। বড় দুঃখ হলো। চীনদেশ থেকে লোক এসেছে কাগজ তৈরি করে দেখাতে, আমেরিকার লোক এসেছে রঙিন ছবি ছেপে দেখাতে। জার্মানীর লোক সংবাদপত্র মুদ্রণের আধুনিকতম কৌশল দেখায়। তিন চার মাইল জুড়ে বিরাট প্রদর্শনী—তার মধ্যে একটা ছোট রেল লাইন পর্যন্ত আছে, তাতে চড়ে এক পাশ থেকে আরেক পাশে যাওয়া যায়।

জার্মান ছেলেমেয়েরা পিঠে একটা Knapsack বেঁধে দল করে বেড়ায়। খুব ছোট ছেলেমেয়েদের দলে একজন বয়স্ক গাইড থাকেন। বেশী বয়সের যুবক যুবতীরাও খাকী পোশাক পরে ও পিঠে খাকী Knapsack বেঁধে বেড়ায়। পোশাকের বালাই জার্মানীতে কম। এই চিঠি লিখছি আর নদীর এক ধারে এক দল ছেলেকে পৌটলা লাঠি ও পতাকা নিয়ে দল বেঁধে যেতে দেখছি। জার্মানীর পথে ঘাটে এই Wandervogel-এর দল। কোলোনে অতি ছোট বাচ্চাদের দল দেখেছি। অগাধ কৌতূহল নিয়ে তারা দেশ দেখে বেড়ায়। কোলোনের ইস্কুলে পড়তে যে সব ছেলেমেয়ে যায় তারাও পিঠে একটা করে চামড়ার ব্যাগ বেঁধে যায়। জার্মানীতে সকলেরই সাইকেল আছে, সাইকেলের ঝাঁক রাস্তা জুড়ে ওড়ে। অতি ক্ষুদ্র শিশু থেকে অতি বৃদ্ধ ঠাকুরদা পর্যন্ত সকলেই সাইকেল চালায়।

কোলোন থেকে বেরিয়ে বনে এলুম। বন ছোট শহর। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবী-বিখ্যাত। সেইখানে Beethoven-এর জন্ম। Beethoven-এর বাড়ী দেখলুম।



কোলোনের গির্জা



বেটোফেন (Beethoven)

সেখানে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন সংগৃহীত হয়েছে—তাঁর পিয়ানো, তাঁর কানে পরবার যন্ত্র, তাঁর হাতের লেখা, তাঁর ছবি। তাঁর ছবির মধ্যে তাঁর ঝড়ঝঙ্কাময় জীবনের ইঙ্গিত আছে। দেখলেই তাঁর সমস্ত জীবন মনে পড়ে যায়। কী কঠোর সাধনা, কী কঠিন দুঃখ! জগৎকে যিনি অমৃতময় সঙ্গীত দিয়ে গেলেন নিজের সঙ্গীত তিনি নিজে শুনতে পেতেন না—তিনি হয়ে গিয়েছিলেন বধির। তাঁকে দেখবার সময় আমার মনে হলো—মহাপুরুষদের প্রতি আমাদের একটা ঋণ আছে, সে ঋণ শোধ করবার একমাত্র উপায় নিজে মহাপুরুষ হওয়া। হাত জোড় করে প্রণাম করা কাপুরুষতা, সম্মান দেখাতে যদি চাও তো সমকক্ষ হও।

বন্ থেকে জাহাজে চলেছি। নদীটি কিন্তু কলকাতার গঙ্গার চেয়ে চওড়া নয়। অথচ এই নদীকে নিয়ে কত গান, কত কাহিনী, কত যুদ্ধ। জাহাজ ও নৌকায় নদীটি সব সময় সেজে রয়েছে। ফরাসী জাহাজ স্ট্রাসবুর্গ্ যাচ্ছে, ওলন্দাজ জাহাজ রটারডাম যাচ্ছে, জার্মান জাহাজ হামবুর্গ্ যাচ্ছে। কত রকম নৌকায় যুবক-যুবতী দাঁড় টেনে রোদ পোহাতে পোহাতে চলেছে, তাদের গা খোলা। সাঁতার দিচ্ছে ছেলেমেয়ে যুবক-যুবতী—একা কিংবা দলে দলে। জার্মেনীতে আজকাল সাঁতারের ধুম, নৌ-চালনার ধুম। যার শরীর আছে সেই শরীর চর্চা করে। যুদ্ধে হেরে জার্মানরা ঠিক করেছে এমন একটা দুর্জয় জাতি সৃষ্টি করবে যে জাতির সঙ্গে কোনো বিষয়ে কোনো জাতি পেরে উঠবে না। সে

জাতি সৃষ্টি করতে হলে মেয়েদের সাহায্য চাই। তাই যেমন স্কুলে কলেজে তেমনি মাঠে নদীতে আকাশে সমুদ্রে মেয়েদের অব্যাহত দ্বার—অবাধ স্বাধীনতা। জার্মানীর অগ্ন্যাগ্ন অঞ্চলের কথা জানিনে, এই রাইনল্যান্ডের মেয়েদের স্বাস্থ্য ও শ্রী দেখে অবাক হতে হয়।

নদীর দু'ধারেই রেলপথ, পাহাড়, ক্ষেত। স্থানে স্থানে গ্রাম বা নগর। কোনো কোনো প্রাচীন ধরণের বাড়ী দেখতে ছবির মতো। ফ্যাক্টরীও স্থানে স্থানে আছে—কদাকার। কোথাও কেউ ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। কোথাও কারা ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসেছে। আজ চমৎকার দিনটি। সূর্যের অসীম দয়া। আমাদের মতো অনেকেই জাহাজে করে বেরিয়েছিল, তারা ফিরছে, তাদের জাহাজ থেকে তারা হাত নেড়ে আমাদের প্রীতি জানাচ্ছে। যারা সাঁতার কাটছে তারাও হাত তুলে প্রীতি জানাচ্ছে। একটা নৌকার উপরে একটা কুকুর দৌড়াদৌড়ি করতে করতে ঘেউ ঘেউ করে আমাদের কেমন প্রীতি জানাচ্ছিল তার মর্ম সেই বোঝে! নদীর ধারে পাহাড়ের তলে ট্রামও চলেছে। পাহাড় ঘেঁসে উঠেছে—প্রাচীন দুর্গ, Drachenfels। এর নামে কবি Byronএর এক কবিতা আছে; পাহাড়ের মাথায় সেই ভাঙা দুর্গ। সর্বত্রই দেখছি হোটেল আর কাফে। আমেরিকানদের দৌলতে পৃথিবীর গরীব দেশগুলোর লোক হোটেল চালিয়ে বড় লোক হয়ে যাচ্ছে।

এখন আমাদের জাহাজ যেখান দিয়ে চলেছে সেখানটার

প্রায় চারিদিকেই পাহাড়। মনে হচ্ছে যেন একটা হ্রদের ভিতর দিয়ে চলেছি। পাহাড়ের পায়ের নিচেই নদী; নদীর পাড় ধরে ট্রেন চলেছে। পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের প্রীতি জানাচ্ছে কত লোক, দূরস্থিত ঘরের জানালা থেকেও প্রীতি-সূচক হাত নাড়া পাচ্ছি আমরা। ট্রেন থেকে, মোটর থেকেও রুমাল নেড়ে লোকে প্রীতি জানাচ্ছে। Bingenএ জাহাজ থেকে নেমে Frankfortএর ট্রেন ধরতে গিয়ে দেখি এক ঝাঁক Wandervogel (উড়ো পাখী)। তারাও ট্রেনে উঠতে ছুটলো। চতুর্থ শ্রেণীতে উঠলো—জার্মেনীর রেল চতুর্থ শ্রেণী অবধি আছে। আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর মতো জার্মেনীর Third ও Fourth classএ কাঠাসন। এই Wandervogelএর ঝাঁকটির একজনের একটি পা নেই, সে কাঠের পায়া বেঁধে পরম উৎসাহে ছুটছিল। ওরা নেমেছে ও সমবেত গান ধরেছে। কী মধুর শোনাচ্ছে ওদের সমবেত গান! কোথায় আমাদের মতো চৈচামেচি করে পাড়া মাথায় করবে, না, ওরা এমন মিষ্টি গান ধরেছে যে কী বলবো!

*

*

*

Frank^{fu}ort-on-Main.

আজ সকালে রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমে যাদের দেখলুম তারা একদল wandervogel—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, কারুর কারুর পিঠে রান্নার ডেক্‌চী। আরেকটু পরে এক জন পথিককে দেখলুম, তার পিঠে পোট্টো, কন্ডল ও লাঠি,

একত্র বাঁধা। দু'জন ছেলেকে দেখলুম রুটি চিবোতে চিবোতে পথ চলছিল। রাস্তায় যত ছেলেমেয়ে দেখি সকলের পিঠে একটি পোঁটলা বা ব্যাগ বাঁধা।

সাইকেল জার্মেনীর সব শহরে এত বেশী যে সাইকেলের চাপে মারা পড়বার ভয়। এক সঙ্গে পঞ্চাশ বাটখানা সাইকেলে সব বয়সের মেয়েপুরুষ রাস্তা জুড়ে চলে।

কোলোনের মতো এখানেও গির্জা ও মিউজিয়াম অনেক। মিউজিয়ামে এত দেশের এত বড় বড় শিল্পীর ছবি থাকে যে কেবল একবার দেখে এলে কত শিক্ষা, কত আনন্দ হয়। যারা ভালো করে ছবি আঁকা শিখতে চায় তারা মিউজিয়ামের ছবির কাছে বসে ছবির নকলে আঁকে। অনেক বুড়ো-বুড়ীকে পর্যন্ত এই কাজ করতে দেখেছি লগুনে ও প্যারীতে। বটানিক্যাল গার্ডেনে কন্সার্ট শুনলুম। অনেকে সেখানে টেনিসও খেলছিল। ছোট ছেলেমেয়েতে বাগানটা ভরে গিয়েছিল। একটা ছেলে মেয়েদের মতো shingle করেছে দেখে হাসি পেল। জার্মেনীতে এক কালে ছেলেরাও ঝুঁটি বাঁধত। Beethoven ও Goethe ছেলে বয়সে ঝুঁটি বাঁধতেন। এখন কিন্তু জার্মানরা সাধারণত নেড়া! তারা ক'বার বেলতলায় যায়? এই শহরেই Goetheর জন্ম। তাঁর বাড়ী দেখলুম। বাড়ীটি সেকালের মতো করে সাজানো।

মেইন নদীর কূলে এই শহর। নদীর এক একটা অংশ ঘেরাও করে গোটা কয়েক swimming bath করা হয়েছে।

তার দেয়ালগুলোতে ছবি আঁকা। তাতে সারাক্ষণ কন্সার্ট চলে। গান ও ছবির আবহাওয়ায় খোলা আকাশের তলে খোলা বাতাসে যারা সাঁতার কাটে, তাদের কেউ বা বৃদ্ধ কেউ বা বালিকা। প্রায় সকলেরই গা খালি। সাঁতারের পরে তাদের কেউ কেউ skip করে, কেউ কেউ বল খেলে, কেউ কেউ কুস্তি লড়ে এবং অনেকে এক একখানা তক্তার উপরে শুয়ে রোদ পোহায়। এসব swimming bath তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ম্যুনিসিপালিটি থেকে।

জার্মেনীর ম্যুনিসিপ্যালিটিগুলোর নিজেদের ড্রাম আছে। ম্যুনিসিপালিটির টাকায় অপেরা হাউস ও থিয়েটার চলে। ম্যুনিসিপ্যালিটির বাড়ীর নিচের তলায় ভোজনাগার করে দেওয়া হয়েছে, তাতে শস্তায় ভালো খাবার দেওয়া হয়। এই সব ভোজনাগার দু'তিনশো বছর ধরে চলে আসছে। আজ এক অন্ধকে দেখেছিলুম, তার সঙ্গে এক ক্রস্‌চিহ্নিত কুকুর। সেই কুকুর তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

*

*

*

Heidelberg

হাইডেলবার্গের বিশ্ববিদ্যালয় ৬৫০ বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত। জার্মেনীতে বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কিন্তু হাইডেলবার্গ সব চেয়ে রোমান্টিক। জার্মেনীর একটি প্রসিদ্ধ গানের প্রথম কথা “হাইডেলবার্গে আমি হৃদয় হারিয়েছি।” নেকার নদীর কূলে দুটি পাহাড়ের পাদদেশে এই ছোট শহরটির অবস্থিতি, পাহাড়ের উপরে এক বৃহৎ দুর্গ ও উদ্যান।

হাইডেলবার্গেও দেখলুম তেমনি সুইমিংবাথ, তেমনি দাঁড় টানা, তেমনি ঘাসের উপরে খোলা গায়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে সূর্যালোক অনুভব, তেমনি পক্ষী-পক্ষিনীদের দল (Wander-vogel)। সারা জার্মেনী যেন ক্ষেপে গেছে! বুড়ো-বুড়ীরা বাধা দেবে কোথায়, না, বুড়োবুড়ীরাই অগ্রণী। দেশের ছুঃখ আবালবৃদ্ধবনিতার মর্মে বিঁধেছে। তরুণে প্রবীণে গালাগালি দলাদলির অবসর নেই। দুর্গম পথে ছেলেদের নেত্রী হয়েছে এক বুড়ী, তার পিঠে বস্তু। পাঁচ বছরের খোকাখুকী নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, গুরুজন দাঁড়িয়ে দেখছেন।

*

*

*

Wurzburg

৮ই সেপ্টেম্বর

এটি একটি প্রাচীন ছোট শহর। জার্মেনীর প্রত্যেক শহরে অধিকাংশ গ্রামে ট্রাম আছে। তোমরা যখন জার্মেনী আসবে তত দিনে সমস্তটা জার্মানী ট্রামে করে ঘোরবার উপায় হয়ে থাকবে।

এখানকার জার্মানরা দেখছি পেয়ালা পেয়ালা নয়, গেলাস গেলাস নয়, ঘড়া ঘড়া বিয়ার খায়। জলও আমরা এত খেতে পারিনে, পেট ভরে যায়। এখানে সেকালের এক মোহান্ত মহারাজের (Prince Bishop) প্রাসাদ আছে, এখন সেটা জাতীয় সম্পত্তি। প্রাসাদটি মহারাজের সৌন্দর্য-প্রিয়তার নিদর্শন চিত্রে ভাস্কর্যে বাস্তবকলায় বহন করছে।

এখানেও একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, এটি চিকিৎসা-বিদ্যার জন্তে প্রসিদ্ধ।

এখানেও Wandervogel ও সাঁতার দাঁড় টানার রেওয়াজ। আরেকটা রেওয়াজ ছবি আঁকার। প্রৌঢ় Nunরা পর্যন্ত কাগজ ক্রেয়ন নিয়ে বসে গেছেন।

একটা হাট দেখলুম। হট্টগোল বাদ দিলে ঠিক আমাদের হাট। শাকসবজীওয়ালী বুড়ীদের কেউ কেউ শাকসবজীর বুড়ি নিয়ে গির্জায় বসে মনস্কামনা জানাচ্ছিল। আরেকটি গির্জায় কতগুলি মনোযোগী বালক-বালিকা আচার্যের কাছে ধর্মশিক্ষা করছিল।

জার্মেনী—বাভেরিয়া

মিউনিক

যেখানে বসে লিখছি, সেটা একটা কাফে। ফ্রান্সের ও জার্মেনীর গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে কাফে আছে। যদিও সব সময় সেখানে চা কিম্বা কফি কিম্বা শোকোলা (Chocolat) কিম্বা হাল্কা মদ খেতে পারা যায় তবু বাড়ীতে কিম্বা রেস্টুরাঁয় রাত্রে খাবার শেষ করে কাফেতে এসে সন্ধ্যা বেলা সবাই বসে। তারপর এক পেয়াল কফি কিম্বা আর কিছু নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, গল্প করে, দাবা খেলে, তাস খেলে, নাচে, গান ধরে, Concert শোনে। সব রকম লোকের জন্তে সব রকম কাফে আছে—ছাত্রদের কাফেতে তারা চা খেতে খেতে বই পড়তে পারে। অবশ্য কেবল বই পড়তে কেউ আসে না, মাঝে মাঝে ইয়ার্কি দিতে ও নাচতেও আসে। মজুরদের কাফেগুলিতে মহা হৈ চৈ হয়, তারা দিনে খেটে খুটে এতটা শ্রান্ত হয়ে আসে যে ঘড়া ঘড়া বিয়ার খেয়েও তাদের ক্ষুধা থাকে না। এখানে একটা প্রসিদ্ধ বিয়ার হল আছে—ম্যুউনিসিপালিটি থেকে তৈরি করে দেওয়া। তার নিচের তলায় মজুর-মজুরনীদেব আড্ডা, মাঝের তলায় ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাদের, শেষের তলায় কোনো উৎসব রজনীতে সমবেত সাধারণের। বিরাট ব্যাপার, এক একটা ঘরে হাজার দু'হাজার বসবার জায়গা।

আমাদের এই কাফেটাতেও শ'দু'য়েক লোকের উপযুক্ত চেয়ার টেবিল। আমি যদি ইচ্ছা করি তো এখানে বসে চার ঘণ্টা ধরে চিঠি লিখতে পারি, Concert শুনতে পারি, অথচ এগারো বারো আনার বেশী খরচ নাও কর্ত পারি। পারীর কাফেগুলো আরো অনেক সস্তা, তবে কন্সার্ট-ওয়াল কাফেতে খরচ আরো বেশীও হয়। পারীতে অসংখ্য কাফে—কত লোক সে সব কাফেতে কাজ করে খাচ্ছে। কাফেগুলোর দৌলতে কত গায়ক বাদকের অন্ন হয় একবার ভেবে দেখো। এমন সব কাফে আছে যেখানে প্রধানতঃ আর্টিস্টরা যায়। সে রকম জায়গায় কত রকম ভাবের আদান প্রদান হয়। এক একটা কাফে যেন এক একটা সভা সমিতি। চাইলেই খবরের কাগজ পড়তে দেয়, কাজেই reading roomও বলতে পারো। আমাদের চায়ের দোকান-গুলোকে কাফেতে পরিণত করলে বেশ হয়।

মিউনিককে জার্মানরা বলে ম্যুইন্শেন্। এর কথা বলবার আগে তোমাদের বলি Dinkelsbuhl-এর কথা। ওটি এই বাভেরিয়ারই একটি ছোট্ট শহর। কিছু দিন আগে ওর সহস্র বার্ষিকী হয়ে গেল। এই এক সহস্র বৎসর ঐ ছোট্ট শহরটিকে ঠিক একই রকম রাখা হয়েছে, ওর আশেপাশের কোনো জায়গার সঙ্গে আর ওর মেলে না। পুরোনো বাড়ী ভেঙে গেলে পুরোনো রীতিতে গড়ে দেওয়া হয়, পুরোনো রাস্তা মেরামত হয় পুরোনো পদ্ধতিতে। তবে জল—আলো—স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি একালের মতো। ওখানে অনেকগুলি

চার-পাঁচ তলা গম্বুজ (Tower) আছে, তাতে মানুষ থাকে। যে টাওয়ারটিতে উঠেছিলুম সেটির সব উপরের তলায় ছিল এক ছোট খুকী আর তার মা বাবা। মনুমেন্টের মতো উঁচু টাওয়ার, কাজেই খুকীকে সাবধানে রাখতে হয়। নিচের একটি তলায় ছিল এক ভ্রাম্যমান আর্টিস্ট আর তার সঙ্গিনী। তারা বার্লিন থেকে ছবি আঁকতে আঁকতে দেশ দেখতে দেখতে এসেছে, Dinkelsbuhlএর ছবি দু'জনে আঁকছিল। তাদের সম্বল মাত্র তাদের পিঠের পোঁটলা (জার্মান ভাষায় বলে rucksack)। তাদের খাওয়া-পরা খুব সাদাসিধে—মেয়েটির পরণে রঙীন খদ্দর আর ছেলেটির খাকী হাফ-প্যান্ট ও শার্ট। ইংলণ্ডে এ সব অচল।

Dinkelsbuhlএ যে হোটেলে ছিলুম সে হোটেলের মালিকের মতো আমুদে লোক অল্পই দেখেছি। লোকটি ইংলণ্ডে দশ এগারো বছর ছিল, যুদ্ধের সময় তাকে Isle of Manএ অন্তরীণ করে রাখা হয়। যুদ্ধের পরে ছাড়া পেয়ে সে দেশে ফিরে হোটেল খুলেছে, কিন্তু যুদ্ধে তার যথা সর্বস্ব বিশ হাজার টাকা লোকসান যায় বলে এখনো একবার ইংলণ্ডে গিয়ে তার আধা ইংরেজ মেয়েছটিকে দেখে আসতে পারছেন না। সে আমাদের রবীন্দ্রনাথের একজন ভক্ত আর গান্ধীকেও খুব ভালোবাসে। কুস্তীগীর গামা, ইমাম-বল্ল ও কার্লার সঙ্গে তার লগুনে ভাব হয়েছিল। সে একবার ভারতবর্ষে যেতে চায়, কিছু টাকা জমালে পরে। লোকটি এমন চমৎকার গাইতে বাজাতে ও আসর জমাতে পারে যে

শুধু সেই জগ্ৰই অনেক লোক তার ওখানে খেতে আসে, জার্মেনীর একালের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর পর্যন্ত ।

মিউনিক বিয়ারের জগ্ৰে, ছবির জগ্ৰে ও আস্বাবের জগ্ৰে বিখ্যাত । শহরটি জার্মান ক্যাথলিকদের প্রধান আড্ডা । সুন্দর শহর । ক্যাথলিকরা সৌন্দর্যপ্রিয় ।

মিউনিকের মিউজিয়ামগুলির একটির নাম *Deutsch Museum* অর্থাৎ জার্মান মিউজিয়াম । ভালো করে সেটি দেখলে বিজ্ঞানের সব কথা চুম্বকে জানা যায় । আদিম মানুষ কী রকম ভাবে বাস কর্ত সেকথা বোঝানো হয়েছে কৃত্রিম গুহা নির্মাণ করে ছবি ঁকে । কয়লা কেমন করে পাওয়া যায় সে জগ্ৰে একটি আস্ত খনি তৈরি হয়েছে, সেই খনির ভিতরে নেমে গেলে মনে থাকে না যে এটা খনি নয় মিউজিয়াম । কৃত্রিম লোহার কারখানা, কেমিস্টের ল্যাবরেটরী, এরোপ্লেনের ক্রমোন্নতি, ছাপাখানার ক্রমোন্নতি, রেডিয়ামের আলো, ইলেক্ট্রিসিটির লীলা, সেন্ট্রাল হীটিং কেমন করে হয়, কাপড় তৈরির আদি অন্ত, কলের সাহায্যে গো-দোহন, কোন খাচ্ছে কত সার আছে, এই রকম কত ব্যাপার যে সে বৃহৎ মিউজিয়ামটাতে আছে তা দিনের পর দিন দেখলেও শেষ হয় না, সে কথা আমি লিখলেও শেষ হবে না ।

এসব দেখতে লাখলাখ ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ী যায় ; নুনরা পর্যন্ত মেয়ের দলকে *Blast furnace*-এর তত্ত্ব বুঝিয়ে দেয় ; দেশের সকলেই বিজ্ঞানের উন্নতিতে আগ্রহ

দেখায়। আমরা যেমন হরি নাম জপ করি এরা তেমনি বিজ্ঞানের নাম জপ করে।

আরেকটা মিউজিয়ামে সেকালের পোশাক, আস্‌বাব, অস্ত্র, ইত্যাদি শতাব্দী অনুসারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর লোক কেমন ঘরে থাকত, কেমন খাটে শুতো, কী কী পোশাক পরত, কেমন তাদের গহনা, কেমন তাদের বর্ম—এসব জানতে চাইলে এই মিউজিয়ামে যেতে হয়। থিয়েটারওয়ালারা এ সব দেখে অভিনেতা অভিনেত্রীদের সেকালের মতো করে সাজায়। এ রকম মিউজিয়াম কোলোনেও আছে।

চিত্রশালা মিউনিকে অনেক। একটাতে প্রাচীনদের ছবি, আরেকটাতে আধুনিকদের ছবি। আরেকটাতে অত্যাধুনিকদের ছবি। প্রতি বছর প্রায় হাজার দু' তিন নূতন ছবি শেষোক্ত চিত্রশালাটিতে প্রদর্শিত হয়। এক মিউনিকেই এই। সমগ্র জার্মেনীর চিত্রকরেরা বছরে ক' হাজার ছবি আঁকেন? অসংখ্য লোক ছবি আঁকে, আরো অসংখ্য লোক প্রসিদ্ধ ছবি নকল করে। ছবি নকল করাও ভারি শক্ত কাজ, সে জগ্গে তারা মজুরিও পায় যথেষ্ট, কেননা ধনীরা সে সব নকল ছবি কিনে নিয়ে ঘর সাজায়! ছবি নকল করার কাজে মেয়েরাই যায় বেশী। সেই তাদের জীবিকা।

মিউনিকে এখন একটি প্রদর্শনী বসেছে, শীঘ্রই একটা মেলা বসবে। প্রদর্শনীটি কোলোনের মতো বড় না হলেও

বেশ বড়। এরও একটি ছোট্ট রেলগাড়ী, নাগরদোলা, খাবার ঘর, পুতুল-থিয়েটার ইত্যাদি আছে। প্রদর্শনীটি গৃহ রচনা বিষয়ক। অল্প খরচে কত রকম বাড়ী তৈরি করতে পারা যায়, কী কী আস্বাবে তাকে সাজাতে পারা যায়, ছেলের ঘর কেমন হবে, মেয়ের ঘর কেমন হবে, রোগীর ঘর কেমন হবে, খাবার ঘর কেমন হবে, এই সকলের নমুনা দেখানো হয়েছে। ইলেকট্রিক ঝাঁটা, ইলেকট্রিক উত্তুন, ইলেকট্রিক চিকিৎসা, স্নান যন্ত্র, ডিম তাজা রাখবার যন্ত্র, খাবার তাজা রাখবার উপায়, শিশুর নতুন ধরণের খেলাঘর, সাদাসিধে অথচ নতুন ধরণের চেয়ার টেবিল খাট বিছানা কোচ দেরাজ, এমনি অনেক জিনিস সেখানে দেখে নিয়ে ব্যবহারে লাগানো যায়। ঘর সাজানো ইউরোপে একটা আর্ট রূপে গণ্য। এ সম্বন্ধে অনেক মাসিকপত্র চলে। গৃহিণীরা তাই পড়ে কোন জিনিসটি কোন জায়গায় রাখতে হবে তাই শেখেন এবং আস্বাব পত্র ফ্যাসান অনুসারে বদলান। এখন আন্দোলন চলেছে আস্বাব পত্র সাদাসিধে অথচ মজ্জ্বল এবং পরিপাটী করতে। একটা ঘরে গুণে গুণে মাত্র গোটাকয়েক আস্বাব রাখতে হবে, ঘরে ঢুকলেই যেন মনে হয় এটা গুদাম নয় এটা আলো হাওয়ায় ভরা খেলার মাঠের মতো ফাঁকা জায়গা। জার্মানরা এখন সূর্যোপাসক হয়েছে। সূর্যের উপরে লেখা মাসিক পত্র অনেক, তাতে সূর্যের আলো থেকে স্বাস্থ্য ও শক্তি সংগ্রহের কথা থাকে। ছোট ছেলেমেয়েদের এখন খালি পায়ে খালি গায়ে খেলতে

দেওয়া হয়। খালি পায়ে জল ঘাঁটতেও অনেক ছেলেকে দেখেছি।

প্রদর্শনীতে দেখলুম সমগ্র জার্মেনীতে “উড়ো পাখী”দের জন্তে প্রায় আড়াই হাজার বাসা আছে, সেখানে প্রায় পঁচিশ লাখ পক্ষি-পক্ষিনী রাত কাটাতে পারে। সারাদিন পায়ে হেঁটে বেড়াবার পর সন্ধ্যাবেলা একটা বাসায় উঠে রেঁধে খাওয়া, আর গান গল্প বিশ্রাম। ভোরে উঠে আবার অচিন বাসার অভিমুখে রওনা হওয়া। এমনি করে ছুটি কাটে। ছুটিতে কেউ বাড়ী থাকে না। এই সব বাসা যৌবন-আন্দোলনের কর্তৃপক্ষরা চালান। আমাদের যদি যৌবন-আন্দোলন করতে হয় তবে প্রথমে নিজের নিজের জেলার মধ্যেই করতে হবে। ধরো, একটা জেলায় যতগুলো ইন্সকুল আছে প্রত্যেকের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হবে যে কোনো একটা ইন্সকুলের ছেলেরা বেড়াতে বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলা যে গ্রামে পৌঁছবে সেই গ্রামের ইন্সকুলের মাঠে রান্না করবে ও ইন্সকুলের বারাণ্ডায় শোবে। সেই ইন্সকুলের ছেলেরা যদি বাড়ী থাকে তো অভ্যাগতদের দেখবে শুনবে সাহায্য করবে। দুই পক্ষে বন্ধুতা হবে। নিজের জেলার সকলের সঙ্গে ভাব হলে পরে দেশের সকলের সঙ্গে ভাব। সেটাও যখন শেষ হবে তখন বিদেশের সকলের সঙ্গে ভাব।

মিউনিক, ১৩৩৫

হাঙ্গেরী

মিউনিকের কাফেতে যে চিঠি শুরু করেছিলুম সে চিঠি আজ বুডাপেস্টের কাফেতে বসে শেষ করছি। ইতিমধ্যেই ভিয়েনায় দিন কয়েক কাটিয়ে এলুম। ভিয়েনা খুব বড় শহর, আগে ইউরোপের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ছিল, এখন চতুর্থ বৃহত্তম শহর। বলো দেখি, এখনকার তৃতীয় বৃহত্তম শহর তবে কোনটি? প্যারিস্। দ্বিতীয়? বার্লিন।

লোকসংখ্যা কমে গেছে, সে সমৃদ্ধিও আর নেই। বড় বড় প্রাসাদের মতো বাড়ী পড়ে রয়েছে, কিন্তু অত বড় পুরীতে মাত্র আঠার লাখ লোক। আগে ভিয়েনা ছিল বিরাট অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের রাজধানী, এখন অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী ভেঙে চারটে রাজ্য হয়েছে এবং আরো তিনটে রাজ্যকে ভাগ দেওয়া হয়েছে। অস্ট্রিয়ার চেহারা এখন ভাঙা বাড়ীর মতো। এমন দেশে ভিয়েনাকে আর মানায় না।

রাজপ্রসাদগুলোকে এখন মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে। সবশুদ্ধ চল্লিশের বেশী মিউজিয়াম আছে ভিয়েনায়। স্টেট থিয়েটার আর স্টেট অপেরা আগের মতোই চলছে, আরো অনেক থিয়েটার সিনেমা ও নাচঘরও চলছে। হোটেল রেস্ট'রা ও কাফে অনেক আছে, লোক হয় না বেশী। সেই জগ্গে সেগুলো বেশ সস্তা। রান্নার জগ্গে ভিয়েনা আগে যেমন অতুলনীয় ছিল এখনো তেমনি। অস্ট্রিয়ানরা

এখন বেশীর ভাগ সোশ্যালিস্ট হলেও আগের মতো কায়দা ছুরস্ত ও জাঁকালো। পুলিশম্যানের সাজ যেন সেনাপতির সাজ, তরোয়ালটি কোমরে ঝুলছে। কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলেই সেলাম ঠোকে। এটা জার্মান পুলিশ মাত্রেরই স্বভাব। তারা ভারি বিনয়ী। অস্ট্রিয়ানরাও জার্মান। জার্মেনীতে সাধারণতঃ বাস নেই, ভিয়েনায় অল্প।

ভিয়েনার রাজবাড়ীগুলো চমৎকার। কয়েক বছর আগে যেখানে সম্রাট-সম্রাজ্ঞী ছাড়া আর কারুর পা পড়ত না এখন সেসব সকলেরই সম্পত্তি। সম্রাজ্ঞীর বাগানবাড়ীতে এখন রাস্তার ছেলেমেয়েরা খেলা করতে যায়। বাগানবাড়ীর এক একটা ঘরে এক এক দেশের ছবি কাঁচের দেয়ালের ভিতর থেকে ঝাঁটা। একটা ঘরে কেবল চীনা ছবি, একটা ঘরে কেবল জাপানী ছবি, এবং যে ঘরটা বানাতে দশ লাখ টাকা লেগেছিল সে ঘরটাতে হিন্দু মুসলমান ছবি। এসব দেড়শো বছর আগে সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসার কীত। ভিয়েনার সর্বত্র মেরিয়া থেরেসার প্রভাব। অস্ট্রিয়ার রাজবংশ ছিলেন ইউরোপের সবচেয়ে বনেদী রাজবংশ। প্রায় সাতশো বছর ধরে তাঁরা ভিয়েনার শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন, গত মহাযুদ্ধে তাঁদের পতন হলো। এখন অস্ট্রিয়া গণতন্ত্র ও ভিয়েনার লোক সোশ্যালিস্ট। নতুন বাড়ীও তৈরি হচ্ছে, সে সব বাড়ী খুব নতুন ধরণের। তাদের দেয়ালগুলো বইয়ের শেলফের মতো দেখতে। ইউরোপে প্রতি দিন নতুন ধরণের বাড়ী তৈরি, নতুন ধরণের বাড়ী সাজানো, নতুন ধরণের আলো-

উত্তাপ-জলের ব্যবস্থা। ইউরোপ নিত্য নূতন। ভিয়েনাতেও একটা বাড়ী সাজানোর প্রদর্শনী চলছে। দেখে ধন্য ধন্য করতে হয় শিল্পীদের।

মিউনিকের রাজবাড়ীও এখন সাধারণের সম্পত্তি। রাজবাড়ীগুলোতে ছবি ও মূর্তি আছে অসংখ্য। রাজারা শিল্পদ্রব্যের কদর বুঝতেন। তাঁদের সংগৃহীত শিল্পদ্রব্য দেখতে দেশবিদেশের লোকে আসে, কিন্তু তাঁরা আসতে পারেন না। মিউনিকের ও ভিয়েনার গড়ন ভারি সুন্দর, পারী ছাড়া খুব কম শহরের গড়ন এত ভালো। এও সেই রাজাদের গুণে। স্টেট অপেরা ও স্টেট থিয়েটারগুলোও তাঁদের সৃষ্টি।

ভিয়েনা শহরটি পাহাড়ে ঘেরা Danube নদীর কূলে। শহরের মাঝখানে বৃত্তাকার একটা রাস্তা। এই রাস্তাটাকে বলে “Ring”। এমন সুন্দর ও এমন দীর্ঘ রাজপথ পৃথিবীর কোথাও নেই বোধ হয়। রাজপথের দুই ধারে তরুবীথি। ফ্রান্সে ও জার্মেনাতেও এই রকম।

ভিয়েনাকে সেখানকার লোকে বলে ভিন্ (Wien) আর Danubeকে বলে ডোনাউ (Donau)। নদীটি ক্রমশ চওড়া হতে হতে এই Budapestএ কল্‌কাতার গঙ্গার চেয়েও চওড়া হয়েছে। নদীর দুই ধারে শহর। মাঝখানে দ্বীপ। এক পাশে পাহাড়। পাহাড়ের উপর সুন্দর সুন্দর বাড়ী। রাস্তায় রাস্তায় গাছ। আমি একটা গাছের কাছে বসেই লিখছি খোলা আকাশের তলে ফুটপাথের একাংশে। মেঘলা রাত।

হাঙ্গেরীর লোক ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকের থেকে জাতে পৃথক—এরা মঙ্গোলিয়ান বংশীয় ম্যাগিয়ার (Magyar)। কিন্তু হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না। খুব খুঁটিয়ে দেখলে ধরা পড়ে—এদের চোখ ও ভুরু কতকটা চীনাদের মতো। কিন্তু নাক আর রঙ ইউরোপীয়দের মতো। হাঙ্গেরীর শহরের লোকেরা সব বিষয়ে ইউরোপীয় হয়েছে বটে, কিন্তু পাড়া-গাঁয়েরা এখনো মুসলমানদের মতো আছে। তাদের মেয়েরা ঘাগ্‌রা পরে, মাথায় রঙীন ওড়না বাঁধে। আর পুরুষেরা ঢিলে পোশাক পরে। হাঙ্গেরীর লোক তুর্কীর লোকের মাস্তুতো ভাই, বহুকাল তুর্কীর অধীনেও ছিল। বোধ হয় সেই সব কারণে এরা কতক বিষয় ইউরোপের লোকের উল্টো। এরা বলে “রায় শঙ্কর অন্নদা”, ১৯২৮, সেপ্টেম্বর, ১৮ই।*

হাঙ্গেরী এখন অস্ট্রিয়ার থেকে ভিন্ন হয়েছে, এটাও এখন গণতন্ত্র। তবে এখানে জমিদারদের প্রভাব বেশী।

বুডাপেস্টে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর ৩ সম্রাটের প্রাসাদ আছে। বৃহৎ প্রাসাদ, পাহাড়ের উপরে। মিউজিয়াম যেমন সর্বত্র তেমনি এখানেও। স্টেট অপেরা ও স্টেট থিয়েটারেও তেমনি। হাঙ্গেরিয়ানদের সঙ্গীত ইউরোপ-প্রসিদ্ধ। হাঙ্গেরিয়ানরাও ক্যাথলিক। এখানে তাদের অনেক প্রাচীন গির্জা আছে।

* আমরা বলি ৭৮ টা (সাড়ে সাতটা)। এরা বলে ৮৮টা (আধ আটটা)।

হাজার খানেক বছর আগে হাঙ্গেরীর লোক খ্রীস্টান হয়ে যায়। যে দিন তারা খ্রীস্টান হয়েছিল সেই দিনটার স্মৃতি উৎসব প্রতি বছর হয়। তখন তারা একটা ঘোড়া বলি দেয়।

ইংলণ্ড থেকে যতই পূর্ব দিকে আসছি ততই আমাদের দেশের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখছি। স্টেশনে হাঁক ডাক, থিয়েটারে হৈ চৈ, রাস্তায় সোরগোল ক্রমে বাড়ছে। পোশাকও সাদাসিধে—মজুরদের খালি গা, গরীবের ছেলেদের খালি পা। পিঠে ঘাসের বোঝা বা কাপড়ের বোঁচকা বেঁধে মেয়েরা চলেছে।

বুডাপেস্ট, ১৩৩৫

অস্ট্রিয়া

আবার ভিয়েনায় এলুম। ভিয়েনার মায়া কাটানো শক্ত। ওরকম একটি সুন্দর শহরে অন্ততঃ মাস তিনেক থাকতে হয়, তা নইলে অতৃপ্তি থেকে যায়। রাতের ভিয়েনা একটা দেখবার জিনিস। প্রত্যেক রাত্রেই দেয়ালি। ভিয়েনার কাছে ও দূরে অসংখ্য পাহাড়। সে সব পাহাড়ের কোথাও কোথাও পুরোনো তীর্থ আছে, সেখানে দিগ্দিগন্তের যাত্রীরা এসে ধন্য দেয়, মানং করে। আগাগোড়া হিঁচুয়ানী। আধ্যাত্মিক বলে আমাদের ঐ অহঙ্কারটা এ সব দেখে শুনে রীতিমতো ঘা খায়। যদি আমেরিকায় যাও তো fundamentalistদের দেখে কখনো মনে হবে না যে ওরা কুসংস্কারে আমাদের গুরু হবার অযোগ্য। আমেরিকার এক জগদ্গুর্বা সম্প্রতি এই লগুনে ভয়ঙ্কর বক্তৃতা দিয়ে পাপীতাপীদের উদ্ধার করছেন—ভীষণ ভীড়। কাল Chaliapineএর গান ও Rubinowitshএর বাজনা শুনে রয়াল এলবার্ট হলের বাইরে এসে দেখি হাজার দশেক লোক স্বর্গে যাবার জন্তে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে। হায়, হায়, তখন আমার এমন ক্ষিদে পেয়েছিল যে পকেট হাণ্ডে এক আধখানা চকোলেট বা টফী যদি পেতুম তবে ওদের দলে ভিড়ে যেতুম, এমন সুযোগ ছাড়তুম না।

ভিয়েনা থেকে অস্ট্রিয়ান টিরোল্ দিয়ে সুইটজারল্যান্ডে আসি। টিরোলের মতো সুন্দর প্রদেশ ইউরোপে আছে

কি না জানি নে। যতদূর চোখ যায় কেবল পাহাড় আর হ্রদ আর সমতল মাঠ। পাহাড়ে বরফ জমেছে, মেঘ ঘিরেছে, বৃষ্টি নেমেছে ; হ্রদের জল স্বচ্ছ, একটি দুটি নৌকা ভাসছে, মাঠের কোণে চাষার কুটীর, অচেনা ফুল, অজানা ফসল। চাষার মেয়েরা ট্রেনে উঠছে, ট্রেনে বসে গান ধরেছে, সেলাই করছে। চাষারা ট্রেনে উঠেই নমস্কার করছে সবাইকে, নেমে যাবার সময় নমস্কার পাচ্ছে সকলের কাছে। রেলের লোক টিকিট দেখবার জন্যে এসে কাছে বসে ছুঁদণ্ড গল্প করে যাচ্ছে, হাসি ঠাট্টায় যোগ দিচ্ছে। রেলও তেমনি দিলদরিয়া মেজাজে টুক্ টুক্ করে চলেছে, এমন সুন্দর পথটা সে এক নিঃশ্বাসে কাটিয়ে যেতে চায় না। তাড়া কিসের ? এমন সুন্দর জগৎ, এখান থেকে পালিয়ে মরবো কোন স্বর্গে ? টিরোলের ভিতর দিয়ে আসবার সময় একটুও ইচ্ছা করছিল না চোখ দুটোকে নড়াতে কিংবা বুজতে।

যে গ্রামে সন্ধ্যা হলো সেই গ্রামে নেমে পড়া গেল। গ্রামটা বড়, নাম Bishopspofen। গোটা চার পাঁচ হোটেল আছে, সিনেমা ও নাচঘর তো আছেই। পরিষ্কার মজ্জবুৎ রাস্তা, বাড়ীগুলো ঘন নিবিষ্ট। ইউরোপের গ্রামগুলো বাস্তবিক বড় আরামের। শহরের সব সুবিধার সঙ্গে গ্রামের সব সুখ মিশিয়ে যা হয় তাই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত—সেকলে গ্রাম বা একেলে শহর কোনোটাই কাম্য নয়। ইলেকট্রিকের আলো ও উন্নত, সেন্ট্রাল হীটিং, টেলিফোন ও রেডিও—ইউরোপে যে কোনো বড় গ্রামে এ গুলি আছে।

তারপর আছে কাফে, রেস্টুরাঁ, যেমন সর্বত্র থাকে। মাঝে মাঝে গান বাজনার সঙ্গত হয়, যাত্রা পার্বণের বিজ্ঞাপনও চোখে পড়ল। গির্জা তো থাকবেই।

গ্রামটা পর্বতবেষ্টিত। ঐ অঞ্চলের সব গ্রামই ঐ রকম।

পরদিন ইন্সব্রুক দিয়ে সুইটজারল্যান্ডে প্রবেশ করলুম। সুইটজারল্যান্ডকে আর নূতন মনে হলো না। কেন যে লোকে অস্ট্রিয়ান টিরোলে না গিয়ে সুইটজারল্যান্ডে ছোট্ট ভেবে কারণ পেলুম না, সম্ভবত লোকে এখনো অস্ট্রিয়ান টিরোলার স্বাদ পায় নি। এবং সম্ভবত লোকে জনাকীর্ণ অঞ্চলে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গ পেতেই বেশী ভালোবাসে। সুইটজারল্যান্ডে এখন হার্ট বসেছে, ছুনিয়ার যে যেখানে ছিল সবাই এসে জুটেছে—কেউ স্বাস্থ্যের জন্তে, কেউ আমোদের জন্তে, কেউ জীবিকার জন্তে এবং কেউ শিক্ষার জন্তে।

সুইটজারল্যান্ডের লুসার্ন শহরটি ছোট, কিন্তু একখানি ছবির মতো সুন্দর। যে হ্রদের ধারে তার স্থিতি, সে হ্রদটি নদীর মতো অঁকা বাঁকা অথচ সমুদ্রের মতো দিগন্ত জোড়া। হ্রদের চারিদিকে পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় বরফ। মেঘের ফাঁক দিয়ে যখন সূর্য উকি মারে তখন পাহাড় আর হ্রদ কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখে ঠিক করতে পারি নে। জোর করে চোখ বুঁজে ধ্যানের মতো ভাবি, মায়া, সব মায়া।

লুসার্নের কাছটা নাকি অতীত কালে একটা সমুদ্র ছিল, তার পরে সমুদ্র সরে গেলে সেখানে বড় বড় সব glacier

উঁচু থেকে নামত আর পাথরের ভিতরে গর্ত রেখে যেত।
সেকালের সেই সব চিহ্ন লুসার্নের একটা জায়গায় আছে।

ইন্টারলাকেনও একটা ছোট শহর, তার দু'পাশে দুটো
হ্রদ এবং চারিদিকে পাহাড়। শহরটা লুসার্নেরই মতো
হোটেল ভরা। সুইজটজারল্যান্ডে হোটেল ছাড়া বড় কিছু
নেই। সেই সব হোটেল চালিয়ে বিদেশীদের টাকায় সুইসরা
বড় মানুষ। সুইসদের মধ্যে ভিখারী বা বেকার তো নেইই,
খুব বড় লোকও নেই।

বার্ণ শহরটি সুইটজারল্যান্ডের রাজধানী, তা তো
জানোই। ঐ অঞ্চলে এক কালো ভালুক ছিল—সেই
থেকে অঞ্চলটির নাম (জার্মান ভাষায়)—“ভালুক”।
এখনো বার্ণে গোটা কয়েক ভালুক আছে। শহরের সব
জায়গায় ভালুকের মূর্তি বা ছবি দেখা যায়, পতাকাতেও
ভালুক। বার্ণের রাস্তাগুলোর দু'পাশে যে ফুটপাথ আছে
সে ফুটপাথের ছাদ থাকায় বড় সুবিধা হয়েছে, রোদ জলের
ভয় নেই। বার্ণের এটা বিশেষত্ব।

বার্ণে এখন একটা প্রদর্শনী বসেছে, বৃহৎ প্রদর্শনী,
কোলোনের “প্রেসা”র চেয়ে কিছু ছোট। প্রদর্শনীতে সুইস
মেয়েরা কত রকম কাজ করে থাকে তারই একটা আভাস
দেওয়া হয়েছে। বোঝা গেল মেয়েরা ঘরের ও বাইরের
কোনো রকম কাজে পেছপাও নয়, তারা চাষও করে, বাগানও
করে, কারখানাও চলায়, ডাক্তারখানাও চলায়। মেয়েরাও
যে দেশে শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন করে সে দেশের শিল্প-দ্রব্য বিদেশে

সস্তায় বিক্রী হতে পারে, সুতরাং বিদেশের বাজার দখল করে। যেমন জাপান আমাদের বাজার দখল করেছে প্রাধানত মেয়েদের দ্বারা শিল্প-দ্রব্য উৎপন্ন করিয়ে। আমাদের মেয়েদেরকে দিয়ে কেবল রান্না করিয়ে আমরা ঠকে গেছি। গ্যাস্ ও ইলেকট্রিসিটির সাহায্যে ইউরোপে রান্না করতে অত্যন্ত কম সময় লাগে, তা ছাড়া এরা খায়ও অল্প—দু'তিন রকম তরকারি। বাড়ীর সবাই এক সঙ্গে বসে একই রকম তরকারি খায় বলে পাঁচ জনের জন্তে পাঁচ রকম রান্নাতে পাঁচবার কয়লা নষ্ট করতে হয় না, পাঁচবার খাবার জায়গা পরিষ্কার করতে হয় না, পাঁচবার বাসন মাজতে হয় না, পাঁচবার পরিবেশন করতে হয় না। এমন করে সময় বাঁচে অনেক। তা ছাড়া মা বাবা ভাই বোন মিলে গল্প করতে করতে পরস্পরকে সাহায্য করতে করতে খাওয়া কত বড় একটা আনন্দ।

বার্ণ থেকে আসি প্যারিসে। ফ্রান্সে চড়াই উৎরাই যদিও আছে তবু অস্ট্রিয়া বা সুইটজারল্যান্ডের মতো নয়। অস্ট্রিয়ার ও রাইনল্যান্ডের কত টানেলের ভিতর দিয়ে রেল যায়, সুইজারল্যান্ডে কত উপত্যকার ভিতর দিয়ে। ফ্রান্স প্রাধানত সমতল বলে রেলের বেগ ভয়ঙ্কর বেশী। ফরাসীরা একটু বেপরোয়াও বটে। প্যারিসের মোটরওয়ালাদের দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই, তারা মোটর হাঁকায় যেন পুষ্পক-বিমান। তবু যে দুর্ঘটনা হয় না এটা ওদের চোখের ও হাতের গুণ। প্যারিসের রাস্তার হাঁটবার সময় প্রাণের মায়া ছাড়তে হয়, রেলে চড়বার সময়ও তাই।

লণ্ডন থেকে প্যারিস্ যেন কল্কাতা থেকে মধুপুর। মাঝখানে একটা চ্যানেল (সমুদ্র) থেকে মাটি করেছে। সেটুকু পারাপার করবার সময় বড্ড গা বমি বমি করে। ঐটুকুর ভয়ে বেশীর ভাগ ইংরেজ দ্বীপ থেকে বেরুতে চায় না, কুণো বলে তাদের সবাই ঠাট্টা করে।

ছবির আবহাওয়াটি প্যারিসের বিশেষত্ব। জার্মেনীর যেমন গানের আবহাওয়া। প্যারিসে যেখানে যাই দেখি কেউ না কেউ ছবি আঁকছে—নদীর ধারে কেউ মাছ ধরছে, কেউ ছবি আঁকছে, কাফেতে বসে কেউ সরবৎ খাচ্ছে, কেউ ছবি আঁকছে, এমন কি রাস্তায় ধারেও কেউ লোক চলাচল দেখছে আর এঁকে নিচ্ছে। নানা দেশের চিত্রকর দেখি, চীনা-ম্যানও আছে। প্যারিসে ছবি ও মূর্তির ছড়াছড়ি—যাছুঘর ও চিত্র-প্রদর্শনী বাদ দিলেও মাঠে ঘাটে যত চিত্র ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখি তত কোথাও দেখিনি। অভিনয়-কলাটাও প্যারিসের হাওয়াতে মিশে রয়েছে—পাঁচ বছরের যে কোনো একটি খুকীও এক নিপুণ অভিযাত্রীর মতো চলে ও কথা বলে। আর সেন নদীর ধারে পুরোনো বইয়ের দোকান বড় কম নেই। ফরাসীদের খুব বই পড়ার সখ বলে ফরাসী বইগুলো সস্তাও খুব। ফরাসী খবরের কাগজও অসম্ভব সস্তা, যদিও বিজ্ঞাপন তারা কম ছাপে আমাদের চেয়ে। ফরাসীরা মোটে চার কোটি হয়েও কেন পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠ জাতি তা' এর থেকে কিছু কিছু অনুমান করতে পারবে।

আবার জার্মেনী

আইসেনাখ, জার্মেনী ।

তোমাদের জার্মেনীর মানচিত্রে বোধ হয় আইসেনাখকে খুঁজে বের করতে পারবে না। তাই বলে দিচ্ছি, এটি ভাইমারের কিছু পশ্চিমে। জার্মেনীর এই অঞ্চলটিকে বলে ঠুরিজিয়া। যেখানে বসে লিখছি সেখান থেকে যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল পাহাড় আর ফার্ গাছের বন আর উপত্যকা আর বিরল-বসতি গ্রাম। একটি ছোট পাহাড়ের উপরে অতি প্রাচীন ভার্টবুর্গ, দুর্গ; তার দ্বারদেশে মার্টিন লুথার তাঁর প্রোটেষ্ট্যান্ট প্রচার করেন; সেই থেকে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ছেড়ে অনেক লোক বেরিয়ে যায়—তাদের নাম হয় প্রোটেষ্ট্যান্ট। দুই দলে ত্রিশ বছর ধরে যুদ্ধ চলে; শেষে একটা আপোস হয়।

মার্টিন লুথারের ধর্মমত ছিল বড় নীরস—গান বাজনা ছবি ও মূর্তি ইত্যাদির তিনি ছিলেন জাত-শত্রু। ক্যাথলিকরা কতকটা সাকারবাদী; প্রোটেষ্ট্যান্টরা ঘোরতর নিরাকারবাদী। ক্রমে ক্রমে প্রোটেষ্ট্যান্টরাও গান বাজনার অভাব বোধ করে; তখন তাদের মধ্যে এক মস্ত বড় গুলী লোকের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম বাখ। বাখের পরে আরো অনেক সঙ্গীতজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছে—যেমন, মোৎসার্ট, বেঠোভন,

ভাগ্নার। কিন্তু অনেকের মতে বাখ্ হুচ্ছেন সঙ্গীতসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট। মার্টিন্ লুথারের মতো বাখ্ও এই আইসেনাখের লোক।

ফ্রান্সের প্রাণ যেমন প্যারিস, ইংলণ্ডের প্রাণ যেমন লণ্ডন, জার্মেনীর প্রাণ তেমন কোনো একটা স্থানে কেন্দ্রীভূত নয়, ছোট-বড় নানা গ্রামে শহরে ছড়ানো। তাই জার্মেনীকে জানতে হলে বার্লিনে কিম্বা ভিয়েনায় বসে থাকলে চলে না। জার্মেনীর প্রায় প্রত্যেক জেলারই স্বতন্ত্র প্রাণ। জেলাগুলি এক কালে স্বাধীন রাজ্য ছিল, তাদের কোনোটার মালিক রাজা-রাজড়া, কোনোটার মালিক ধর্মযাজক, কোনোটার বা সর্বসাধারণ। তাদের আকার আয়তনও অত্যন্ত অসমান। কোনোটা হয়তো মাত্র একটা শহর, কোনোটা বাংলা দেশের চেয়ে বড়।

নিজের দেশের স্বাভাবিক ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হবার জগ্গেই উড়োপাখীর ঝাঁক তীর্থ-যাত্রীর মতো বেরিয়ে পড়ে। Wandervogelদের কথা আমি আগেই লিখেছি—জার্মেনীর প্রত্যেক স্থানে এত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিদেশীর পক্ষেও জার্মেনীতে তীর্থ পরিক্রমা করে আনন্দ আছে। জার্মেনীর সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়। কিছুকাল থেকে জার্মেনীতে বিদ্যাচর্চার চেয়ে অর্থ চর্চা প্রবলতর হয়েছে। জার্মেনীর সর্বত্র এখন কারখানা। কারখানার কাজ শেখবার ইন্স্কুল কলেজ প্রত্যেক শহরেই আছে, এবং শহর জার্মেনীতে অসংখ্য। গান বাজনার সখ জার্মান মাত্রেই দেখছি।

আইসেনাখে আসবার আগে ছিলুম ডার্মস্টাড্টে। ওটা ফ্রাঙ্কফুর্টের কিছু দক্ষিণে। সুন্দর শহর। ওর কাছাকাছি অনেক পাহাড়। পাহাড়ের উপরে দুর্গ। পাহাড়গুলোতে কোনো রকম বুনো জানোয়ার নেই। বনগুলো সাধারণত বীচগাছের, ফারগাছের বন। কাজেই তোমরা যেমন পার্কে হাওয়া খেতে যাও, জার্মানরা তেমনি পাহাড়ে হাওয়া খেতে যায়। পাহাড়গুলো পনেরো শো ফুটের বেশী উঁচু নয়।

ডার্মস্টাড্ট কতটুকুই বা শহর! তবু তাতে মিউজিয়াম, অপেরা হাউস ও চিত্রশালা আছে। এই আইসেনাখেও মিউজিয়াম আছে গুলি তিন চার। সভ্যতার নিদর্শন আমাদের নেই কেন?

ডার্মস্টাড্টে আসবার আগে ছিলুম সার্কস্কনের কাছাকাছি একটি ছোট গ্রামে। বুস্ তার নাম। আগে তার কথা লিখেছি। এবার সেখানে থাকবার সময় সেখানকার একটা পোড়ো বাড়ীতে আগুন লাগে। গ্রামের এক ফায়ার-ব্রিগেড ছিল বঠে, কিন্তু তারা এতই কর্মদক্ষ যে বাড়ীখানা তিন ঘণ্টা ধরে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার আগে তারা জলসেচ করবার সুবিধে করে উঠতে পারলে না। সারা গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলেরই ইচ্ছা যে পোড়ো বাড়ীখানা পুড়ে ছাই হয়ে যাক, আমরা দেখি। বাড়ীতে জনপ্রাণী ছিল না, জিনিসও ছিল না কিছু।

বুসে যাবার আগে রাইন নদীর খানিকটা জাহাজে করে বেড়াই। কোরেন্স থেকে মাইল। মাইল শহরটার বয়স



অল্প বয়সী যক্ষ্মা রোগীদের ক্লিনিক



Rembrandt-ଙ୍କ Night watch ଛିତ୍ର

হাজার দুয়েক বছর। তার মালিক ছিলেন এক ধর্মযাজক। মাইন্সের গির্জা হাজার বছর পুরোণো। মাইন্সের লোক এখনো খুব ধর্মপ্রবণ। গির্জাতে উপাসনার সময় স্থান ধরছিল না। রাস্তায় প্রায় দু'তিন হাজার বালিকা ধর্মপতাকা ধরে শোভাযাত্রায় চলেছিল। তাদের অনেকের হাতে বাতায়ন্ত্র, অধিকাংশের কণ্ঠে গান।

কোলোনের গল্প আগে লিখেছি। কোলোনে আমি আসি আম্স্টার্ডাম থেকে। আম্স্টার্ডাম শহরটাতে রাস্তা আছে যত কেনাল আছে তত। কেনালগুলো দিয়ে মাল আমদানি রপ্তানি হয়। যাবতীয় ভারি ট্রাফিক্ জলপথগামী। ঐটুকু দেশ হল্যাণ্ড, তবু আম্স্টার্ডাম বন্দরে জাহাজের সংখ্যা নেই।

আম্স্টার্ডামের বড় মিউজিয়মটাতে দেদার ছবি আছে। হল্যাণ্ডের লোক ছবি ঝাঁকায় ওস্তাদ। হল্যাণ্ডের বাড়ী-গুলোর গড়নেরও বিশেষত্ব আছে। অনেক বাড়ীর দেয়াল ঘেঁষে কেনাল গেছে। জানালা থেকে পা ঝুলিয়ে দিলে জলে পড়ে। কিন্তু কেনালের জলের গন্ধ তোমাদের নাকে সইবে না।

আটস্টারডামে জাভার লোক প্রায়ই দেখতুম। একটা মিউজিয়াম আছে, তাতে জাভা প্রভৃতি হল্যাণ্ড-শাসিত দেশের শিল্পদ্রব্য সংগৃহীত হয়েছে। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখে বোঝা গেল জাভার হিন্দু সভ্যতা আমাদের থেকে খানিকটা ভিন্ন হ'লেও একেবারে ভিন্ন নয়। রামের রং

শাদা, কৃষ্ণকে দেখতে দাঁতওয়ালা রান্ধসের মতো, লক্ষ্মী সরস্বতীর ফুঁতিবাজ চেহারা ; কেবল গণেশটিকে দেখে একটু গম্ভীর মনে হলো ।

হল্যাণ্ডের রাজধানী হেগ্ শহরটি সুন্দর আর ছোট । তার ভিতর দিয়েও কেনাল গেছে—কিন্তু আলপনার মতো । হেগ্ এ সবাই সাইকেল চড়ে—এত সাইকেল আর কোথাও দেখিনি । পুলিশকেও সাইকেল চড়ে পাহারা দিয়ে বেড়াতে আর কোথাও দেখেছি কি ?



মধ্য জার্মেনী

ভাইমার, জার্মেনী

ভাইমার ছোট্ট একটি শহর। এখানে মহাকবি গ্যায়টে ছিলেন রাজমন্ত্রী। তাঁর বাড়ী ও বাগান-বাড়ী এখানকার বিশিষ্ট সম্পদ। বাগান-বাড়ীতে তিনি মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতে যেতেন; ছোট বাড়ী; বেশী কিছু সাজ সরঞ্জাম নেই, খান কয়েক মানচিত্র ছাড়া। কিন্তু তাঁর আসল বাড়ীটা সত্যিই একটা মিউজিয়াম হবার উপযুক্ত! তাতে অজস্র ছবি ও মূর্তি, অসংখ্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং অনেক ভাষার অনেক বিষয়ের অনেক গ্রন্থ রয়েছে—সে সব গ্যায়টের নিজের সংগৃহীত, নিজের ব্যবহৃত। গ্যায়টেকে লোকে কেবল কবি ও ঋষি বলেই জানে; কিন্তু তিনি তখনকার কালের পক্ষে একজন উঁচুদরের বৈজ্ঞানিকও ছিলেন! পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান (metallurgy) প্রভৃতি অনেকগুলি বিজ্ঞান তাঁর হাতে কলমে জানা ছিল এবং চোখের সঙ্গে রঙের যোগাযোগ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব একটা থিওরী চলিত আছে। তাঁর ল্যাবরেটরী দেখে তাঁর বহুমুখ কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায়, কত রকম প্রজ্ঞাপতি ও শামুক তিনি সমস্তে সাজিয়ে রেখেছিলেন, এখনো রয়েছে।

মহাকবি শিলারও ছিলেন এই ভাইমার শহরে। একটি

ছোট্ট শহরে ছ'জন মহাকবির সমাবেশ যেন এক সঙ্গে সূর্য চন্দ্রের উদয়।

বার্লিন থেকে লাইপ্‌ৎসিগ্‌, জার্মেনী

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শহর বার্লিন আমার পছন্দ হয়নি। কেম হয়নি কারণ বলা শক্ত। তোমরা হয়তো চেপে ধরবে, বলবে—বাঃ রে, এমন সব চওড়া চওড়া রাস্তা, আলো বাতাসের জগ্গে এত প্রচুর ফাঁক, এমন সব মজ্‌বুৎ অট্টালিকা, ভূমিকম্প হয়ে গেলেও টলবার নয়, এমন সব জ্বরদস্ত মানুষ, কাবুলীওয়ালার মতো চেহারা ; তবু তোমার পছন্দ হলো না ? আমি এর জবাবে বলবো—সব ঠিক, তবু শহরটা যেন কলের মতো চলছে, যেন প্রাণী নয়, যন্ত্র। অগুনতি কলকারখানা তার দিকে দিকে, রাস্তায় রাস্তায় লরী ঘুরছে, মানুষগুলো যত পারে কলকে খাটিয়ে নিচ্ছে। পোস্টাফিসের চিঠি চালাচালি হয় এক নলের ভিতর দিয়ে। বড় বড় রাস্তাগুলোতে গাড়ী থামবার জগ্গে পুলিশ নেই, লাল-সবুজ-হলদে সিগ্‌নল্ দেখে গাড়ীগুলো আপনি থামে, চলে মন্তর হয়ে। কোনো কোনো থিয়েটারের স্টেজ্‌ ঘূর্ণ্যমান—অর্থাৎ একটা দৃশ্য শেষ হয়ে গেলে সীন্ ফেলতে হয় না, সীন্ তুলতে হয় না, সমস্ত স্টেজ্‌টাই পাশ ফিরে দাঁড়ায়, তখন দেখা যায় যেখানে একটা চায়ের আড্ডা ছিল সেখানে একটা বৈঠকখানা। অভিনয় শুরু হবার আগে থেকেই গোটা কয়েক দৃশ্য স্টেজের এ পিঠে ও পিঠে সাজানো থাকে,

অভিনয় হবার সময়ও উণ্টো পিঠটাতে সাজানো চলতে থাকে।

বার্লিন হচ্ছে এরোপ্লেনের প্রধান আড্ডা। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় শঙ্খচিলের মতো এরোপ্লেন উড়ছে। এরোপ্লেনের আওয়াজ জেপলিনের আওয়াজের কাছে লাগে না। এরোপ্লেনের চেহারাও জেপলিনের মতো হাস্যকর নয়। জেপলিনটা একটা অতিকায় মাছের মতো দেখতে। অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে হেলে ছুলে ধীরে সুস্থে সাঁতার দেয়।

জার্মেনীর প্রত্যেক জায়গায়—বিশেষ করে বার্লিনে—অসংখ্য নাপিতের দোকান। যে কোনো রাস্তায় পা দিলেই দেখা যায়—“নাপিত” “নাপিত” “নাপিত”……(friseur)। গ্রীষ্মকালটা প্রায় প্রত্যেক জার্মান পুরুষই মাথা মুড়ায়। আমার মাথায় চুল দেখে আমার বন্ধুরা ধরে বসেছিল—“মাথা মুড়োতে হবে। কেবল সামনের দিকে কাকাতুয়ার মতো ঝুঁটি রাখলেই চলবে।” তোমরা জার্মেনীতে এলে কাকাতুয়া সেজো। জার্মান মেয়েরা অগ্ন্যাগ্ন ইউরোপীয় মেয়েদের মতো প্রায়ই চুল ছাঁটায়, কিবা শীত কিবা গ্রীষ্ম। তাই এত নাপিত।

বার্লিনের চিড়িয়াখানাটা দেখবার মতো। পশুপাখী যেমন সব দেশের চিড়িয়াখানায় তেমনি বার্লিনেও। কিন্তু পশুপাখীর থাকবার জন্তে এমন সুন্দর পাহাড়, গুহা, মন্দির, প্যাগোডা ইত্যাদি কোথাও নেই। হাতীরা যেখানে থাকে

সেটা একটা ভারতবর্ষীয় মন্দিরসমষ্টি। উটপাখী যেখানে থাকে সেটা প্রাচীন ঐজিপ্টের ধরণে তৈরি ও তার গায়ে প্রাচীন ঐজিপ্টের নক্সা। রেড্‌ ইণ্ডিয়ান ও চীনে ধরণের পশুপক্ষীশালাও আছে। জীবজন্তুর পাথরের গড়া মূর্তিও স্থানে স্থানে স্থাপিত।

নেলোর থেকে সংগৃহীত ভারতবর্ষীয় গাই বাছুর ও ষাঁড় দেখে দেশের কত কথাই না মনে পড়ল! বার্লিনে ওরা অগ্ন্যাগ্ন জন্তুদের সঙ্গে জন্তু; লোকে ওদের পাঁউরুটি চকোলেট্‌, ছুঁড়ে খাওয়াচ্ছে। আমাদের দেশে ওরা দেবতার মতো সেবা ও ভক্তি পায়, মায়ের মতো ভাইয়ের মতো মমতা পায়। এখানে কেউ ওদের ঘাস খাইয়ে সুখ পায় না, সুখ দেয় না। দেশের জন্তু বেচারীদের মন কেমন করছে! খোলা মাঠের, জন্তু রাখালের গোষ্ঠের জন্তু!

জাগুয়ারেরা পরস্পরের লেজ টানাটানি করে বেশ সুখে আছে। সিংহরা পড়ে পড়ে ঘুমোয়। ওদের বাচ্চাদেরকে একটা কুকুর মাই দেয় এবং ছোট ছেলেমেয়েরা কোলে নিয়ে ফোটো তোলায়। সিংহের বাচ্চারা খুব নিরীহ ও হাসি-খুশি! সুন্দর বনের বাঘটা বাংলাদেশ ছেড়ে এসে বড় একলা বোধ করছে, নিশ্চয়ই তোমাদের কথা ভেবে ওর কান্না পাচ্ছে। চিড়িয়াখানাতে থাকতেই সেদিন আমাদের দেশের হাতী-হাতিনীর এক বাচ্চা হয়েছে, ভারি চপল।



গ্যস্টে (Goethe)



Raphael-এর Sistine Madonna চিত্র

ড্রেস্‌ডেন

লাইপৎসীগ্‌ বার্লিনের মতো শিল্পবহুল হলেও বার্লিনের চেয়ে ফাঁকা। নতুন টাউন হল, নতুন থিয়েটার, নতুন রেলস্টেশন ইত্যাদি লাইপৎসীগের বাস্তব সম্পদ। গান বাজনার জন্তে লাইপৎসীগের জগদ্ব্যাপী সুখ্যাতি। প্রায় প্রত্যেক কাফে রেস্টুরাঁতে সঙ্গীতের আয়োজন।

ড্রেস্‌ডেন লাইপৎসীগের চাইতেই বার্লিনের চাইতে দেখতে সুন্দর, কিন্তু যত সুন্দর ভেবেছিলুম তত সুন্দর নয়, বড় আড়ম্বর সম্পন্ন। গির্জাগুলোর ভিতরে ও বাইরে রকমারি নক্সা—প্রাসাদগুলোর তো কথাই নেই। লক্ষ্মীয়েব সঞ্চে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়। ড্রেস্‌ডেনের রাজারা সিংহাসন ছেড়ে চলে গেছে—প্রজারা নিজেরাই নিজেদের চালক। রাজাদের সঞ্চিত মণিমাণিক্য এখন সবাইকে দেখানো হয়—হীরা, নীলা, হাতীর দাঁত ও mother-o-pearl-এর কাজ। আমাদের মোগল বাদশাদের দরবারেও একটা ছোট আকারের মডেল দেখলুম। সিংহাসনে সম্রাট বসেছেন, তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করছে কারা সব, হাতীতে চড়ে কারা সব এসেছেন, প্রহরী সভাসদ ও ভৃত্যগণ নিজের নিজের স্থানে দণ্ডায়মান। সোনারূপার কাজ। একখানা হীরা সম্রাটের পায়ের কাছে।

ড্রেস্‌ডেনের চিত্রশালার দেশ-বিদেশে নাম আছে। তার সম্পদ Raphaelএর শ্রেষ্ঠ কীর্তি Sistine Madonna; তাই দেখতেই ড্রেস্‌ডেনে কত লোক আসে।

ড্রেসডেনের চিড়িয়াখানার প্রধান সম্পদটিকে তোমাদের দেখতে ভারি ইচ্ছা করবে। “Charlie” কেবল যে সাইকেল চালায় তাই নয়, স্কেট করে, স্লুজে চড়ে, দড়ির ওপর হাঁটে, বলের ওপর দাঁড়িয়ে বল্টোকে গড়াতে গড়াতে নিয়ে যায়, টেবিলে খায় ও তার মাস্টারকে খাওয়ায়। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ Charlieকে দিয়ে বেশ রোজগার করিয়ে নেন; কেননা তাকে দেখতে আলাদা করে পয়সা দিয়ে অনেক লোক আসে ও হাসে। সেটি একটি শিম্পাঞ্জি।

১৩৩৬

চেকোস্লোভাকিয়া

চেকোস্লোভাকিয়া নামটি নতুন বলে দেশটি নতুন নয়। সেকালে যাকে বোহিমিয়া বলা হতো তারই সঙ্গে হাঙ্গেরীর উত্তরাংশ যোগ করে দুইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে চেকোস্লোভাকিয়া অর্থাৎ চেক ও স্লোভাকদের দেশ।

প্রাহা বা প্রাগ, এই দেশের রাজধানী। শহরটির বয়স পনেরো শো বছরের কিছু বেশী। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের দ্বিতীয় পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়। Vltava নদীর দুধারে শহর, নদীটি বেশ বড় ও কতকটা আঁকাবাঁকা, শহরের একদিকে পাহাড়। শহরটি উঁচুনিচু।

বৃহৎ শহর। সম্প্রতি লোকসংখ্যা বাড়তে বাড়তে দশ লাখের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। লোকের ভিড়ে পথ চলা দায়। পাথর বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দিনরাত ঘোড়ায় টানা গাড়ী চলেছে—তার শব্দে রাত্রে ঘুম হয় না। চেকোস্লোভাকিয়া আগে ছিল চাষাদের দেশ। এখন দিন দিন তার যন্ত্রশিল্পের উন্নতি হচ্ছে। তাই প্রাহার আয়তন দ্রুতগতিতে বাড়তেই লেগেছে। Vltava নদী Elbe নদীতে পড়েছে—Elbe নদী সমুদ্রে। বন্দর হিসাবে প্রাহা মন্দ নয়। এরোপ্লেনের চলাচল খুব বেশী।

প্রাহার প্রাচীন নগরগৃহের গায়ে একটি ঘড়ি আছে। বারোটা বাজলে বারোজন apostle ঘড়ির নিচে দুটি

জানালা খুলে সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে দর্শন দেন। হ্রাদচানী পাহাড়ের উপরে এক প্রসিদ্ধ গির্জা আছে—তাতে এই সময়টায় একটা উৎসব চলেছে; দেশের সব গ্রাম থেকে লোক আসে। তাই দেখতে গিয়ে দেখি ভীষণ ভিড়। পুরীর মন্দিরের মতো। চেকরা ধর্মপ্রাণ জাতি। এক প্রাহা শহরেই নাকি একশোটা গির্জা আছে। দেখি সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে; সারি বেঁধে লোক দাঁড়িয়ে গেছে; খোলা দরজা দিয়ে একটি একটি করে লোক ঢুকছে। আমাদের চেক বন্ধুণী পুলিশকে বললেন, “ইনি ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন। কাল চলে যাবেন। এঁর প্রবেশের সুবিধা করে দিন।” তখন পুলিশ একজন সরকারী কেরানীকে ওকথা বললে। সে ভদ্রলোক বললেন, “আপনারা আমার পিছু পিছু আসুন, এখানে আপনাদের টিকিট দিলে লোকে ভাববে পক্ষপাত দেখাচ্ছি।” তাঁর সঙ্গে গিয়ে লুকিয়ে টিকিট কেনা গেল—তারপরে আমরা জনতার সারির ভিতরে এক জায়গায় একটু ফাঁক দেখে দাঁড়িয়ে গেলুম। ওটা অবশ্য অণ্ডায়, কেননা আগে থেকে যারা টিকিট কিনেছিল তাদের অনেকে রইল আমাদের পিছনে। একটু একটু করে এগিয়ে দরজার অনেকটা কাছে এসেছি এমন সময় দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা শ’ তিন চার লোক বাদ পড়ে গেলুম। সবাই মিলে বিষম প্রতিবাদ করতে লাগলো। বললে, আমরা তিনঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি, সাতদিন আগে থেকে টিকিট কিনেছি, দাঙ্গা বাধে আর কি? পুলিশরা বললে, “আমরা কী

কর্বো? হুকুম দিয়েছেন উপরওয়ালারা।” তখন জনতা বললে, “ডাকো উপরওয়ালাদের। ওরা কেমন উপরওয়ালার একবার দেখে নিই।” বেশীক্ষণ ওদের দলে না দাঁড়িয়ে আমরা গির্জার অগ্ন্য একটা দরজার অভিমুখে চললুম। সেটিতে ঢুকতে গিয়ে শুনি সেটা কেবল বড় বড় আমীর ওমরাহদের জগ্গে। তখন কী করি? গির্জার একটা অংশে বিনা টিকিটে ঢুকতে দেয়। সেই অংশটা দেখলুম। যেখানটায় সেকালের রাজাদের রত্নময় মুকুট-দণ্ড ইত্যাদি রক্ষিত ছিল সেখানটা কেবল আমীর ওমরাহরাই দেখতে লাগলো, বাইরে থাকলো প্রত্যাখ্যাত জনতা।

ঐ গির্জার অভ্যন্তরে সাধুদের মূর্তি আছে। প্রাহা নগরী এক কালে সাধুসন্তদের পীঠস্থান ছিল। প্রাহার সেকালের একজন পুণ্যবান রাজা খ্রীষ্টীয় জগতের সর্বত্র প্রখ্যাত।

প্রাহাতে ইহুদীদের উপরে অত্যন্ত অত্যাচার করা হতো। তাদের Ghetto (ইহুদীপাড়ার) চারিদিকে পাহারা ছিল, অনুমতি না নিয়ে তারা পাড়ার বাইরে যেতে পারতো না এবং সন্ধ্যা হলেই ফিরে আসতে বাধ্য হতো। তারা বংশানুক্রমে সেই পাড়াটিতেই জন্মাতো এবং মরতো—এক একটা ছোট ছোট ঘরে এক একটা একান্নবর্তী পরিবার গোরু-শূণ্ডরের মতো থাকতো। তাদের গোরস্থানটাতে পনেরোশো বছর ধরে সত্তর হাজার শবদেহ প্রোথিত হয়েছে, একটির উপরে একটি, একটির গায়ে আরেকটি।—শেষে বাদশাহ

দ্বিতীয় জোসেফ্‌ ইহুদীদের কতকটা স্বাধীনতা দেন। এবং পরে ক্রমে ক্রমে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায়।

কত অত্যাচার সহ্য করে ইহুদীরা জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদের অন্যতম হয়েছে। যত প্রসিদ্ধ লোকের নাম তোমরা শোন একটু খোঁজ নিলে জানবে তাদের অনেকেই ইহুদী। আমেরিকার ফিল্ম-স্টারদের অনেকেই যে ইহুদী শুনে হয়তো অবিশ্বাস করবে। দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবসাদার ও ফিল্ম-স্টার সব কাজেই ওরা হাত লাগায়।

প্রাহাতেও জার্মেনীর মতো সঙ্গীতের খুব আদর। জার্মানদের সঙ্গে চেকদের বনিবনা নেই, কিন্তু জার্মান সঙ্গীতকে ওরা ছেড়ে থাকতে পারে না। অত্যন্ত বাদবিসম্বাদকে সঙ্গীতচর্চার ঐক্য কতক পরিমাণে লাঘব করেছে। আমার যে বন্ধুণীটির উল্লেখ করছি তাঁর ছেলের বয়স সবে ষোলো বছর, সে জার্মান ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজী এই তিনটে বিদেশী ভাষা এক রকম শিখে নিয়েছে, সঙ্গীতে সে তার মায়ের শিক্ষা পেয়ে ইতিমধ্যেই ওস্তাদ হয়ে উঠেছে! বেহালায় তার পাকা হাত। মহিলাটি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খবর রাখেন, তাই তাঁর ছেলে ভারতবর্ষে গিয়ে যোগীদের শিষ্য হতে চায়। সেদিন উপনিষৎ পড়ছিল। প্রাহাতে রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার বক্তৃতা দিয়েছেন—শুনলুম তাঁকে দেখবার জন্যে লোকারণ্য হয়েছিল।

চেকদের মাথার চুল কালো। রং খুব ফর্সা নয়! রান্নাও

তাদের কতকটা আমাদের রান্নার সঙ্গে মেলে। দই আমি ইংলণ্ডে ফ্রান্সে জার্মেনীতে কত রকম খেয়েছি, কিন্তু দেশের দই খেলুম প্রাহাতেই প্রথম। এক রকম মাছও খেলুম, নদীর মাছ—সেও আমাকে এই প্রথম দেশের মাছের স্বাদ মনে করিয়ে দিল। চেকদের পোশাক এখন সাধারণ ইউরোপীয় পোশাক। কিন্তু স্লোভাকরা এখনো গ্রামা বলে তাদের পোশাক অভিনব। চেক ও স্লোভাক উভয়েই স্লাভ বংশীয়।

ড্রেস্‌ডেন থেকে প্রাহা যাই এল্‌ব নদীর ধার ধরে। ঐ অঞ্চলটি বড় সুন্দর। নদীর পাড় উঁচু হয়ে পাহাড় হয়ে গেছে—খাড়া পাহাড়, ভাঙা ছুর্গের দেয়ালের মতো দেখতে। প্রাহা থেকে নুর্নবার্গ চলেছি। প্রাহা থেকে বেরিয়েই একটা সুড়ং পড়লো (—তোমাদের এই কথা লিখতে লিখতে আরো এক সুড়ং!)—সুড়ংটা ভয়ানক লম্বা। মিনিট পাঁচেক অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আলোকে চললুম। এ অঞ্চলটাও বিলক্ষণ পার্বত্য।

এইবার তোমাদের কিছু চেক ভাষা শিখিয়ে দিই। চেকরা প্রাগকে বলে প্রাহা; কার্লস্‌বাডকে বলে কার্লোভী ভারী, বোডেন বাথকে বলে পোড্‌মোকলী। জার্মান ভাষার সঙ্গে চেক ভাষার এতই তফাৎ। যতগুলো চেক কথা শিখেছিলুম ভুলে গেছি—কেবল মনে আছে যে চেক ভাষায় স্বরবর্ণ বাদ দিয়ে বা অল্প মিশিয়ে ব্যঞ্জনবর্ণের শব্দই অনেক। “তোমার আঙুলটা তোমার গলার ভিতরে

টোকাও”—এর চেক ভাষান্তর হলো, “stro prst skrs krk.” মুরগীকে ওরা বলে Slepicka (স্লপিচ্কা) ।

১৩৩৬

[উপরে যে উৎসবের নাম করেছি সেটা পুণ্যবান রাজা Wenceslasএর সহস্রতম সান্বৎসরিক । গির্জাটার নির্মাণ বহু শতাব্দীর পরে সেদিন সমাপ্ত হয়েছে ।

ইংরেজীতে একটি Christmas Carol (আমাদের যেমন আগমনী গান) আছে সেটি চেকদের পুণ্যবান রাজা Wenceslasকে নিয়ে । “Good King Wenceslas looked out on the Feast of Stephen”. রাজা একটি দরিদ্রকে অন্ন দেবার জন্তে শীত কুয়াশা বরফ তুচ্ছ করে তার কুটীর অবধি হেঁটে যান । Carolটি ইংরেজ ছেলেমেয়েদের ভারি প্রিয় ।]

শেষ জার্মেনী

হুন্‌বার্গ্‌ দেখে তৃপ্তি হলো। সম্প্রতি যতগুলি শহর দেখছি হুন্‌বার্গ্‌ই সব চেয়ে সুন্দর। পুরোনো শহরকে ঘিরে একটা নতুন শহর গড়ে উঠেছে—পুরোনো শহরটারও পরিবর্তন হয়েছে অনেক। তবু মোটের উপর পুরোনো শহরটি পুরোনোই রয়েছে। তার চারদিকে প্রাচীর ও প্রাচীর-তোরণ ও প্রাচীর-গম্বুজ। প্রাচীরের ওপারে পরিখা। পুরোনো শহরটি উঁচু নিচু—একটা দিক তো রীতিমতো পাহাড়ে। রাস্তাগুলোর একটার থেকে আরেকটায় যেতে হলে অনেক সময় সিঁড়ি বেয়ে যেতে হয়। খুব সরু সরু রাস্তা, অনেক সময় কোণাকুণি। নদী একটি শহরের মাঝখানে এঁকেবেঁকে গেছে। নালার মতো ছোট ও অগভীর। নদীর পুল অনেক। নদীর ধারে ধারে বাঁধের মতো দাঁড়িয়েছে। সেকেলে ছাঁদের বাড়ী।

হুন্‌বার্গে জার্মেনীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ডুরার (Durer) বাস করতেন। ডুরারের বাড়ী এখনো তেমনি আছে—যদিও তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ। ডুরারের খান কয়েক ছবির অরিজিনাল এখনো ঐ বাড়ীতে আছে।

জার্মান সঙ্গীতকার ভাগ্নার “মাস্টার সিঙ্গার্স” বলে একখানা অপেরা রচনা করেন। ঐ অপেরার ঘটনাস্থল হুন্‌বার্গের মুচিরা সেকালে একটা কবিওয়ালার দল করেছিল।

দলের নাম “মাস্টার সিঙ্গার্স” বা “ওস্তাদ গাইয়ে” ! মুচিরা সত্যি সত্যিই গানের ওস্তাদ ছিল বলে তাদের গান শুনতে দেশ বিদেশের লোক আসতো। একবার তাদের এক কবির লড়াই হয়। সেই লড়াইয়ের দ্বারা স্থির হয় দু’জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কে একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করবে। যিনি বিচার করে স্থির করেন সেই মুচিটির নাম হান্স সাখ্স (Hans Sachs)। তাঁর বাড়ী এখনো আছে।

হুন্‌বার্গের কয়েকটা গির্জা বাইরে থেকে তথা ভিতর থেকে দেখতে সুন্দর। একটা গির্জার নাম Frauen Kirche বা জননী মেরীর গির্জা। আরেকটার নাম Lorenz Kirche বা সেণ্ট লরেন্সের গির্জা।

জার্মান গ্রাম্যশালা মিউজিয়াম হুন্‌বার্গের গৌরব। মিউজিয়ামের নিচের তলাটা বোধ হয় এককালে একটা মঠ ছিল। গথিক ছাঁদের সীলিং ও খিলান। অনেক খ্রীষ্টীয় মূর্তির ভিড়। উপরের তলায় ডুরার প্রভৃতি চিত্রকরের চিত্রপট। পাশের ঘরগুলিতে সেকেলে পোশাক, সেকেলে আসবাব, সেকেলে বাসন, সেকেলে কলকজা, সেকেলে পুঁথি। গোলোক ধাঁধার মতো বৃহৎ ব্যাপার—একবার চুকলে বেরুবার পথ পাওয়া কঠিন! মিউজিয়ামের বাড়ীটার ছাতের গড়নের বিশিষ্টতা আছে।

হুন্‌বার্গ থেকে আসি Wurzburg, শুধু রাতের বেলাটা সেখানে শুয়ে কাটাতে। Wurzburgএর গল্প আগে লিখেছি। Wurzburg থেকে চলেছি

Frankfurt হয়ে রাইন নদীর ধারে কোলোন্ ও কোলোন্ থেকে আখন (Aachen) হয়ে ব্রাসেল্‌স্‌। হয়তো আজ আখনে রাত কাটাতে পারি। ট্রেনে ঘুম হয় না, নইলে এতবার এখানে ওখানে নেমে হোটেল খুঁজে সময় ও অর্থ নষ্ট করতে হতো না। ট্রেনেতেই খাবার গাড়ী আছে—কোনোটা Mitropa কোম্পানীর, কোনোটা Wagon Lits কোম্পানীর। এদের খাবার গাড়ী কন্টিনেন্টের প্রায় সব দেশেই এক্সপ্রেস্‌ ট্রেনের সঙ্গে থাকে। ইংলণ্ডের খাবার গাড়ীগুলো রেল্‌ কোম্পানীদের নিজেদের সম্পত্তি, যেমন আমাদের দেশেও।

এই মাত্র Wiesbaden এ আমাদের ট্রেন থেমেছে।

প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে বিশ পঁচিশ জন লোক বিয়ার টান্ছে আর গান জুড়ে দিয়েছে। গানটা বোধ হয় তাদের জাতীয় সঙ্গীত কিন্বা তেমনি কিছু যা সবাই এক সঙ্গে গাইতে জানে। বিয়ার ও গান—এ ছোটো জার্মান মাত্রেই টানে ও জানে। যেখানে যাও সেখানেই বিয়ার পান ও বাজগান।

ব্রাসেল্‌স্‌ থেকে লণ্ডন

জার্মেনী থেকে বেল্‌জিয়ামে ঢুকতেই দেখি ঘন সবুজ ঘাসে মোড়া অত্যন্ত অসমতল ভূমি। রেলপথ গেছে এতগুলো ছোট বড় স্লুড়ং দিয়ে যে মাটি আর আকাশ এই দেখা যায় তো এই দেখা যায় না।

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল কল কারখানায় ভরা অপেক্ষাকৃত সমতল অঞ্চল। তারপরে ব্রাসেল্‌স্। অন্ধকার রাত্রে আলোক সজ্জিত ব্রাসেল্‌সে যেন দেয়ালীর উৎসব চলছিল। শনিবারের রাত। অসংখ্য কাফেতে অগুন্তি লোক বসে বিয়ার খাচ্ছে। জার্মেনীতে কাফে আছে বটে, কিন্তু এত নয়। বেল্‌জিয়াম মনে প্রাণে ফরাসী। তবে বেল্‌জিয়ামের অর্ধেক লোক ফ্রেমিশ। ওরা জার্মান ও ওলন্দাজদের সগোত্র। দেখা গেল ব্রাসেল্‌সের সব জায়গায় ছোটো ভাষায় বিধি-নিষেধ ও পথঘাটের নাম লেখা রয়েছে। একটা তো ফরাসী, আরেকটা জার্মান ভাষার অপভ্রংশ এবং ওলন্দাজ ভাষার মতো। যথা, Bruxelles ও Brussel; Rue ও Straat. ব্রাসেল্‌সের প্রায় সকলেই ইংরেজী জানে।

আজ রবিবার। সকালে উঠে দেখি সৈন্তেরা শোভা-যাত্রায় বেরিয়েছে—সবটা রাস্তা জুড়ে। ভারি হৈ চৈ—মিলিটারি বাজনা। ব্রাসেল্‌সের প্রসিদ্ধ ক্যাথিড্রলে গিয়ে দেখি অর্চনা চলেছে, ভক্তরা নম্র হয়ে যোগ দিচ্ছেন। অনেক কালের গির্জা। ভিতরের মূর্তিগুলোকে নির্জীব ও নূতন মনে হলো বাইরের মূর্তিগুলোর তুলনায়।

ব্রাসেল্‌সের টাউন হলও প্রাচীন ও মূর্তিবহুল। বোধ হয় ব্রাসেল্‌সে সবচেয়ে উঁচু তার চূড়া!

হাতে সময় ছিল না বলে কোনো মতে নমো নমো করে ঐ ছোটো দর্শনীয় দেখলুম। ট্রেনের যে গাড়ীটাতে

উঠি সেটাতে জনকয়েক লোক ছুটো বড় বড় খাঁচায় ছ'রকম ছ'ঝাঁক পাখী নিয়ে উঠল। বোধ হয় বিক্রী করতে নিয়ে গেল। ওরা নাম্‌ল ইংরাজীতে যাকে বলা যায় Ghent সেইখানে। ফরাসী নাম Gand (গাঁ)। ফ্লেমিশ্‌ নাম Gent.

১৩৩৬

ইটালী

ইউরোপ ছেড়ে এসেছি, ভারতবর্ষে ভিড়িনি, অবস্থাটা ত্রিশঙ্কুর মতো। এখন এটা লোহিত সাগর। তোমরা ভাবছো, সমুদ্রের জল নিশ্চয়ই লাল। আমি দেখছি, ঘন নীল। সব সমুদ্রের রং এক—তবু নাম তো দিতে হবে একটা।

মার্সেল্‌সে জাহাজ ধরবার আগে আমি কিছু দিন ইটালীটা ঘুরে আসি। লগুন থেকে উত্তর ফ্রান্স ও সুইটজারল্যান্ডের বার্ন ও ইটালীর ডোমোডসোলা কেবল সুড়ং আর সুড়ং। কিন্তু ভারি সুন্দর। ইটালীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা হলো সৌন্দর্যের সূত্রে। উত্তর ইটালীর হ্রদগুলি কী সুন্দর! হ্রদের মাঝখানে দ্বীপ; দ্বীপে যাদের বাড়ী তারা কী ভাগ্যবান!

মিলান ইটালীর সবচেয়ে বড় শহর, কল কারখানায় ভরা। তবু তার থেকে আল্‌বিস্ পাহাড় দেখা যায় ও তার চারিদিকে বন। মিলানের বড় গির্জা (Cathedral) যেমন বৃহৎ তেমনি বিচিত্র। মিলানের একটি পুরাতন মঠে প্রসিদ্ধ চিত্রকর লেওনার্দো দা ভিন্সির অঁকা যীশু খ্রীস্টের “শেষ ভোজন” নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীর চিত্র আছে। ছবিখানার নকল তো আমরা কত দেখেছি, তোমরাও দেখেছ, কিন্তু আসলটির তুলনা হয় না! সামান্য একটা দেয়াল,

তার দিকে তাকালে মনে হয় সত্যিকার একটা ঘরে জলজ্যান্ত মানুষ। সমতলকে অসমতলের মতো করে দেখানো লেওনার্দো ও মিকেলান্জেলোর বিশেষত্ব। ছবি দেখে মনে হয়, ছবি নয়, মূর্তি, চিত্র নয় ভাস্কর্য।

ভেরোনা শহরটি ছোট হলেও খুব পুরোনো। ইটালীর প্রায় সব শহরই অতি প্রাচীন। ভেরোনায় রোমান আমলের amphitheatre (সার্কাস্-ঘর) আছে! সরু সরু গলি দেখলে কাশী মনে পড়ে। ভেরোনায় বড় গির্জায় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পাথরে খোদাই করা মূর্তি দেখলুম। তাকে বলে Byzantine যুগের শিল্প।

ভেনিস্ শহরের বর্ণনা তোমরা কত পড়েছ। শহরটার আর প্রাণ নেই, তার প্রাণ ছিল তার অধুনা লুপ্ত বাণিজ্য। বিদেশীরা যায় গঁদোলায় চড়ে তার ধ্বংসাবশেষ দেখতে। “ছুয়ার খোলা পড়ে আছে কোথায় গেল দ্বারী।” ঘুমন্তপুরীর মতো নিঃশব্দ তার অট্টালিকাগুলো। তার জলময় পথগুলো ছাড়া ছল্ করছে।

রোম ইটালীর রাজধানী হয়ে অবধি আবার জেগে উঠেছে। আগে ছিল পোপের রাজধানী, তার আগে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী। ইটালী আর রোমান সাম্রাজ্য এক নয়, পোপের রাজ্য তো একেবারে আলাদা জিনিস। পোপ হচ্ছেন হুনিয়ায় যেখানে যত ক্যাথলিক আছে সকলের “বাবা”। পোপ-কথাটার অর্থই হচ্ছে, বাবা। বাবাজী এখন রোমের মালিক নন, রোমের এক কোণে তাঁর মঠ-

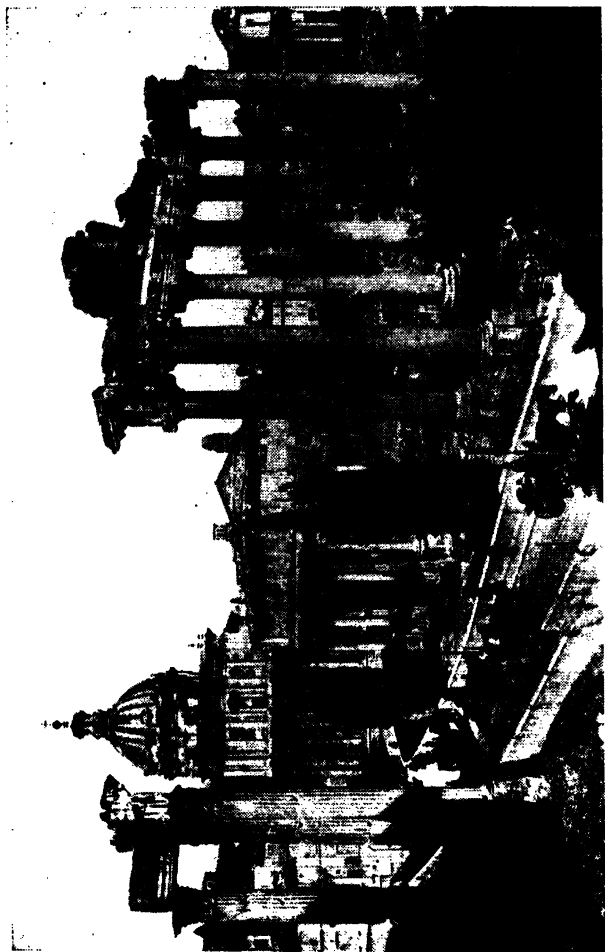
বাড়ীতে তিনি মনের ছুঃখে থাকেন। তাঁর মঠ বাড়ীর নাম ভাটিকান। তার অনেকগুলো ঘরে বড় বড় শিল্পীদের আঁকা অনেক প্রসিদ্ধ চিত্র আছে। মিকেলাঞ্জেলো একটা ঘরের সীলিংকে এমন চেহারা দেন যে মনে হয় একটা অর্ধ চন্দ্রাকার খিলান। রাফেলের আঁকা প্রাচীর-চিত্র তাঁর পঁচিশ বছর বয়সের অমর কীর্তি।

ভাটিকানের কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গির্জা “সেন্ট পিটার”। সব হিন্দুর যেমন কাশী বিশ্বনাথ, সব ক্যাথলিকের তেমনি সেন্ট পিটার। মরার আগে একবার দেখা চাই। রোমে আরো তিনটে বড় বড় গির্জা আছে—সেন্ট জন, সেন্ট মেরী, সেন্ট পল। একটা ছোট অথচ সুন্দরতর গির্জাতে আছে মিকেলাঞ্জেলার মোজেস-মূর্তি। ক্রুদ্ধ মোজেস দাড়ি ছিঁড়ছেন—তাঁর চোখ জ্বলছে, দেহের মাংসপেশীগুলো ফুলে উঠছে ও প্রত্যেকটি শিরা দেখা যাচ্ছে! মর্মর পাথরে এমন করে জীবন্ত্যাস করতে ক’জন পেরেছে ?

রোমানদের রোমের ধ্বংসাবশেষ তাদের কলোসিয়াম, সেটাও একটা সার্কাস-ঘর, সেখানে রোমান রাজারা খ্রীষ্টানদেরকে সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে ছেড়ে দিতো। আন্দ্রোক্লিস ও সিংহের গল্প তো তোমরা জানো। রোমানদের চণ্ডীমণ্ডপ, অর্থাৎ যেখানে তারা আড্ডা দিতো, সেখানটাকে বলে ফোরাম। সেখানে কয়েকটা ভাঙা স্তম্ভ আছে—সুদীর্ঘ, সতেজ, গম্ভীর। শনি মন্দিরের কয়েকটা স্তম্ভ এখনো খাড়া রয়েছে।

কোম্পানী—কলিকতা





রোম—কোলাস্

মিলানোতে মিলন

কথা ছিল মিলানোতে আমাদের দেখা হবে। বন্ধু আসবেন ভিয়েনা থেকে। আমি যাবো লণ্ডন থেকে। মিলানো ইটালীর সব-চেয়ে বড় শহর, সেখানে আমরা কেউ কোনো দিন যাইনি, তবে কেমন করে দেখা হবে বলা তো ? ছোট শহর হ'লে রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে দেখা হতো, কিন্তু কোন একটা গির্জাতে।

বন্ধু লিখেছেন, মিলানোর হোটেলগুলোর নাম তুমিও জানো না, আমিও জানিনি। কিন্তু স্টেশনে নিশ্চয়ই রেস্টোরঁ থাকবে। সেই রেস্টোরঁতে অমুক তারিখের সন্ধ্যায় আমি তোমাকে খুঁজবো, তুমি আমাকে খুঁজবে। কেমন ?

আমি ভাবছি, বাঃ, মিলানোতে যদি একই স্টেশনে লণ্ডনের গাড়ী ও ভিয়েনার গাড়ী না দাঁড়ায় ! কাশীর গাড়ী ও ঢাকার গাড়ী কি কলকাতার একই স্টেশনে দাঁড়ায় ? আর রেস্টোরঁতে দেখা হবার কথা যে লিখেছেন, ধরো যদি আমি ছপুর বেলা পৌঁছাই আর তিনি পৌঁছান রাত্রি দশটায়, তবে কি আমি আট ঘণ্টা রেস্টোরঁতে বসে থাকবো না কি ? আর নেহাৎই যদি তিনি ট্রেন ফেল করেন তবে রেস্টোরঁতে ঘুমুতে দেবে না কিন্তু। এদিকে আমি ইটালিয়ান ভাষায় বিজ্ঞাসাগর। এত বড় পণ্ডিত যে, নিজের মতো পণ্ডিত ছাড়া যার-তার

সঙ্গে কথা বললে মান যায়। ইতর সাধারণের সঙ্গে আমি ইংরেজীতেই কথা কইব স্থির করেছি।

বন্ধুকে চিঠি লেখবার সময় ছিল না। টাইম্-টেব্ল দেখে, ‘তার’ করে দিলুম। মিলানোতে পৌঁছাবো সন্ধ্যা ছ’টায়।

তারপরে লগুনে সেই আমার শেষ দিন। বন্ধু-বান্ধবের কাছে বিদায় নিতে নিতে ও বাজার করতে করতে এত দেরি হলো যে বাধ্য হয়ে ভিক্টোরিয়া স্টেশন পর্যন্ত ট্যাক্সি করতে হোলো। ট্যাক্সিতে বসে টাইম টেব্লটা আরেকবার উন্টে দেখছি, হঠাৎ চোখে পড়ল, আছে, আরো একটা ট্রেন আছে। সেটা ছাড়ে তিন ঘণ্টা পরে, পৌঁছায় তিন ঘণ্টা আগে, কিন্তু যায় অগ্ন একটা লাইন দিয়ে।

তখন স্টেশনের Enquiry Office-এ গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, এ ট্রেনটা যদি হারাই তবে অগ্নটাতে জায়গা পাবো কি না। ওরা বললে, নিশ্চয়। আমি বললুম, ওটা এত ভালো ট্রেন যে ওতে সকলেই যাবে, আগে জানলে রিজার্ভ করতুম। ওরা বললে, ভয় নেই। আজকাল খুব বেশী লোক ইটালী যাচ্ছে না।

ভীষণ খিদে পেয়েছিল, লাঞ্চ খাবার সময় হয়নি।— স্টেশনের রেস্টোরাঁতে গিয়ে ঢুকলুম। এদিকে আমার কোনো কোনো বন্ধু প্ল্যাটফর্মে আমাকে বিদায় দিতে আসবে, কথা ছিল। সেই জগ্নে খুব তাড়াতাড়ি যা পাওয়া গেল তাই খেয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ছুটলুম। কেননা যে ট্রেনে আমার যাবার কথা, সে-ট্রেন ছেড়ে গেলে ওরাও নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে, ওদের

সঙ্গে দেখা হবে না। ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে আমি হাজির! ওরা আমার স্যুটকেস হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ট্রেনে তুলে দিতে চায়—বোধ করি আমাকেও চ্যাংদোলা করে ট্রেনে চাপিয়ে দেবে, এমন সময় আমি বললুম, বন্ধুগণ, ছ' ঘণ্টা পরে একটা উচুদরের ট্রেন আছে, সেইটেতেই আমি যাবো। ওরা তো চটে লাল! বললে, তোমার জন্মে আমরা ততক্ষণ ঘাস কাটি আর কী! আমি বললুম, তোমরা তো বেশ বন্ধু হে! একটা লোক লণ্ডন থেকে ইটালী হ'য়ে ভারতবর্ষে চলে যাচ্ছে, তোমরা ভাবছ গেলে বালাই যায়! না?

ওরা ভারি অপ্রস্তুত হয়ে বললে, তোমার জন্মে আমাদের লাঞ্চ খাওয়া হয়নি, কলেজে যাওয়া হয়নি—এমনি কত কথা। আমি বললুম, এসো তোমাদের খাওয়াই আগে। ওরা খেল, কিন্তু আমার খরচে না। আমি বললুম, ভগবান যখন তোমাদের স্মৃতি দিয়েছেন তখন আমি পীড়াপীড়ি করবো না। আমার পকেট খালি। মিলানোতে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা যদি কাল না হয় তবে টাকার জন্মে একটা তার করবার সঙ্কতিও আমার থাকবে না।

ওদের কেউ কেউ দয়া করে' আমাকে খুচরো ছ' তিনটে পাউণ্ড ধার দিলে। আমি ওদের নামে চেক্ লিখে দিলুম। বললুম, চেক এখন ভাঙাতে গেলে ব্যাঙ্ক তোমাদের গলাধাক্কা দেবে। কেননা ব্যাঙ্কে আমার টাকা জম্মতে আরো সাত আট দিন দেরি। তখন যেয়ো।

ওরা বললে, এসো তাস খেলা যাক্। আমি বললুম, বহুৎ খুব। কিন্তু ভিক্টোরিয়া স্টেশনের ওয়েটিং রুমটা যে এমন বাজে তা কি কেউ ভাবতে পেরেছে? টেবিল আছে বিরাট একটা। চেয়ার মাত্র গোটা-কয়েক, সেও পরের দখলে। তাস খেলা হলো না। তখন একজন বন্ধুকে বললুম, এসো আমার কয়েকটা জিনিস কেনবার আছে, কিনে দাও।

চারটের সময় ট্রেনে বসিয়ে দিয়ে বন্ধুবা হাঁফ ছাড়লে। ঘন ঘন রুমাল নাড়তে নাড়তে ছ' পক্ষের বিদায়! ট্রেন সোঁ সোঁ করে' ছুটে চলল। ভাবলুম, লগুন ছেড়ে যাচ্ছি হয়তো চিরকালের মতো। লগুনের জন্তু ছ' ফোঁটা চোখের জল ফেলি। কিন্তু মনের ওপর পাষণের মতো চেপে রয়েছে মিলানোতে মিলনের চিন্তা। সেই ভীষণ চিন্তা আমার সকল চিন্তা চাপা দিলে। কখন যে Dover এসে পড়ল খেয়ালই ছিল না।

আমার কামরাতে মোটে একটি সহযাত্রী। তিনি বললেন, এরোপ্লেনে গেলে আমার গা-বমি-বমি করে, সেইজন্তে আমি স্টীমারে চ্যানেল পার হবো। আর স্টীমারে চ্যানেল পার হ'লে আমার স্ত্রীর গা-বমি-বমি করে, সেইজন্তে তিনি লগুন থেকে প্যারিস্ এরোপ্লেনে যাচ্ছেন।

ডোভারে ট্রেন থেকে নেমে তিনি ও আমি ভিড়ের মাঝখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলুম। স্টীমারে আমার প্রায়ই গা-বমি-বমি করে। এবার করল না। সমুদ্র এবার খুব ঠাণ্ডা ছিল। আমি ভাবলুম ইংলণ্ড আমাকে স্নেহের সঙ্গে বিদায় দিচ্ছে।

ক্যালাতে দুটো ট্রেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। একজন কর্মচারী জিজ্ঞাসা করল, কোন্ ট্রেন খুঁজছেন? আমি বললুম Bale-এর ট্রেন। সে দেখিয়ে দিল। Douane (Customs House) এর ভিতর দিয়ে যেতে হ'লো না এবার। আমি খুশি হয়ে খুব তাড়াতাড়ি একটা জায়গা দখল ক'রে বসলুম। আগের বারে একটু দেরি করে পস্তাতে হয়েছে।

এবার আমার বরাত ভালো—এক বুড়ী এসে হাঁকলে, রাতের কন্সল? রাতের বালিশ? আমার সঙ্গে বিছানা ছিল না। কারুর সঙ্গে থাকে না। আমি বললুম, দাও। বুড়ী ছ' শিলিং আদায় করলে। আমি কতকটা দিল-দরিয়া মেজাজেই ছিলাম। আগের বারগুলোতে অনেক খোঁজ করেও কন্সল বালিশ পাইনি।

আমার কামরায় আরো দুটি কি তিনটি মানুষ ছিল। অগ্ন্যাগ্ন কামরা খালি যাচ্ছে খবর পেয়ে তারা সকলেই আমাকে ছাড়লে, কেবল একজন ছাড়া। সেও যাচ্ছিল মিলানো—ইংরেজীতে যাকে বলে Milan।

ছ' জনে দুটো বার্থ দখল করে' পা ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজলুম। তখন ট্রেন Laon ছুঁয়ে যাচ্ছে। অগ্ন্যাগ্ন ট্রেন Paris ছুঁয়ে যায়। যে ট্রেনটাতে আমার যাবার কথা ছিল, সেটাও Paris ছুঁয়ে যেতো। সেটা ইটালীতে ঢুকতো Mont Cenis দিয়ে। ইটালীতে ঢোকবার আরো অনেকগুলো রাস্তা আছে। একটা Ventimiglia দিয়ে। একটা Como দিয়ে। আমরা যাবো Domodossola দিয়ে। এগুলো হলো লগুন থেকে

যারা যায় তাদের ঢোকবার রাস্তা আর যারা ভিয়েনা থেকে যায় তারা ঢোকে Brenner Pass দিয়ে কিম্বা Tarvisio দিয়ে কিম্বা Trieste-এর কাছ দিয়ে। প্রত্যেকটা রাস্তাই সুন্দর।

ভোর হলো Bale-এ। তারপরে এলো Berne। সেখান থেকে শুরু হলো Bernese Oberland—পাহাড়ের দেশ। অনেকগুলো সুড়ং। কোনোটার ভিতর দিয়ে যেতে পাঁচ মিনিট লাগে, কোনোটাতে এক মিনিটের কম।

রাত্রে কিছু খাইনি। সকালে সুইজারল্যান্ডের ধরণে ব্রেকফাস্ট খেলুম। বেলা বারোটায় ইটালীর ধরণের লাঞ্চ। Domodossola-য় ইটালীর আরম্ভ। আমাদের দেশের মতো উজ্জল উত্তপ্ত রোডকে ম্লিষ্ট করছিল পাহাড়, ঝর্ণা ও তরুবীথি। Stresa-র কাছে Maggiore হ্রদের দ্বীপগুলিতে কত লোক বাড়ী করে বাগান করে বাস করছে। তারা কী সুখী!

আমাদের কামরায় ছ' একজন ইটালীয় উঠল। কিন্তু তাদের সঙ্গে আলাপ করা আমার বিড়িয়ে কুলোল না। আমার সহযাত্রী ইংরেজটি আরো বিদ্বান। আসছে ম্যান্চেস্টার না লিভারপুল থেকে ব্যবসা সংক্রান্ত কারণে। মিলানোতে কে একজন তাকে নিতে আসবে। পথঘাট, ভাষা ও হোটেলের নাম জানে না!

পৌনে-তিনটের সময় ট্রেন দাঁড়ালো মিলানোর সেন্ট্রাল স্টেশনে। তখন টিকিট দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়লুম। স্টুকেস্টা হাতে করে বেড়ানো যায় না। সেইজন্তে সেটাকে

স্টেশনের Cloak room (যাকে এদেশে Left Luggage Office বলে, সেইখানে) জমা দিয়ে একটা রসিদ নিলুম।

তারপর সাহসে ভর করে বেরিয়ে পড়লুম শহর দেখতে। সঙ্গে একখানা ছোট মানচিত্র ছিল শহরের। তাকেই গুরু করে পথ চিন্তে চিন্তে ‘কুকে’র দোকানে পৌঁছলুম। তারা আমার কাছ থেকে কিছু ইংরেজী মুদ্রা নিয়ে আমাকে ইটালীয় মুদ্রা দিলে। ইটালীয় মুদ্রার বিশেষ দরকার ছিল। ট্রেনে ইংরেজী মুদ্রাতেও কাজ চালানো যায়। কিন্তু ইটালীর দোকানে বা রেষ্টোরাঁতে ইংরেজী মুদ্রা দিলে কেউ নেবে কেন? এমন-কি প্ল্যাটফর্ম-টিকিট কিনে বন্ধুকে খুঁজতে স্টেশনের ভিতর যাই যদি, তাহলেও ইটালীয় মুদ্রা লাগে। কাজেই কুকের দোকানে গিয়ে আমি খুব ভালো কাজ করেছি।

কুকের দোকান থেকে ডাকঘরে গেলুম! সেখানে হাত নেড়ে ও ফরাসীর সাহায্যে পোস্টকার্ড কিনে চিঠি লিখলুম লগুনে। তারপর অনেক ঘুরে ফিরে স্টেশনে পৌঁছলুম। পথে ক্যাথিড্রেলটাও চিনে রাখলুম। ছ’ একটা হোটেলও যে চোখে পড়ল না তা নয়। কিন্তু আমি না হয় ঘর নিলুম। তারপর বন্ধুকে যদি না দেখতে পাই তবে ছু’জনার ঘরের দাম আমাকে দিতে হয়। আর বন্ধুর সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে নিজের জন্তে ঘর নিয়েছি শুনলে তিনি ভাববেন, স্বার্থপর!

খিদে পেয়েছিল। স্টেশনের কাছের একটা কাফেতে গিয়ে কিছু কেক ও ছুধ চাইলুম। কিন্তু ওরা ইংরেজীও বোঝে

না, ফ্রেঞ্চও বোঝে না। তখন জার্মানের যে ছ' একটা কথা শিখেছিলুম তাই বলায় কতকটা ঠাহর করল।

স্টেশনে ফিরে যেখানে টাইম-টেবিল আঁটা থাকে সেখানে গিয়ে ভিয়েনার ট্রেন কখন পৌঁছয় তাই খুঁজতে লাগলুম। ইউরোপের একটা মস্ত সুবিধে এই যে রাশিয়ান ছাড়া অগ্ন্য সব ভাষার হরফ একই রকম। কাজেই ইটালিয়ান নামগুলো পড়তে কিছুমাত্র কষ্ট হলো না—কষ্ট হতো তামিল কিন্না গুজরাটী পড়তে।

আমি ধরে নিয়েছিলুম আমার বন্ধু Brenner Pass-এর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পার্বত্য পথ দিয়ে আসবেন, Verona-তে চেষ্টা করে। সাড়ে ছ'টায় একটা ট্রেন ছিল। সেইটের জগ্নো প্ল্যাটফর্ম-টিকিট কিনতে গেলুম। কিন্তু প্ল্যাটফর্মকে ইটালিয়ান ভাষায় কী বলে জানতুম না। কাজেই টিকিট উইণ্ডোতে না গিয়ে প্ল্যাটফর্ম-টিকিট সাধারণত যে যন্ত্রে থাকে সেইরকম একটা যন্ত্রে মুদ্রা ফেললুম। তাতে উঠল কিন্তু টিকিট নয়, চকোলেট।

তখন আমি প্ল্যাটফর্মের প্রবেশ-দ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। নজর রাখলুম যারা প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে পাচ্ছে তারা কোথেকে প্ল্যাটফর্ম-টিকিট সংগ্রহ করেছে। অল্প সময়ের মধ্যে ধরে ফেললুম তারা প্ল্যাটফর্মের অদূরস্থিত একটা যন্ত্রে বিশেষ মুদ্রা ফেলছে। মুদ্রার একটি ছিল আমার কাছে। সেইটি ফেলে প্ল্যাটফর্ম টিকিট পেলুম।

প্ল্যাটফর্মে ঢোকবার আগে একবার ওয়েটিং রুমগুলো ভালো

করে দেখলুম। যদি বন্ধু ইতিমধ্যেই এসে থাকেন। তারপরে মনে হলো যদি বন্ধু আজ আসবেন না বলে তার করে থাকেন আমাকে এই স্টেশনের ঠিকানায়? অসম্ভব নয়—কেন না Brenner Pass-এর লাইনে ঠিক সময় কনেক্শন পাওয়া যায় না। ট্রেন ফেল করা সহজ।

তখন গেলুম Enquiry Office-এ। ইংরেজীতে বললুম, আমার নামে কোনো টেলিগ্রাম আছে? যে-ছোকরাটি ছিল সে ইংরেজী বোঝে না। বললে, ফ্রেঞ্চ জানেন? ফ্রেঞ্চে যা বললুম তার অর্থ অণু রকম। সে বললে, এটা টেলিগ্রাফ অফিস নয়, তার করতে চান তো বাইরে গিয়ে করতে হবে। আমিও নড়ি না, সেও বোঝে না। তখন হঠাৎ আমার কোটের পকেটে ইটালিয়ান Word Book খানা আবিষ্কার করলুম। সেইখানা তার সামনে খুলে ধরলুম। তখন সে একটা লোককে খবর নিতে বললে—সে লোকটা নাকি ইংরেজী জানে। কিন্তু ও হরি! সেও ছোটো কথাই বেশী জানে না। সে আমাকে নিয়ে মুশকিলে পড়ল। তখন তার মনে পড়ল, স্টেশনে একটি হোটেলের লোক ইংরেজী বোঝে।

সে বললে, কী স্থার? কী ব্যাপার? আমি যেন বন্ধু পেয়ে গেলুম। বললুম আমার নামে যদি কোনো টেলিগ্রাম এসে থাকে খবর নিতে চাই। সে বললে আপনার পাসপোর্টখানা আমার হাতে দিয়ে আমার সঙ্গে আসুন।

টেলিগ্রাম অফিসে কত লোকের নামে টেলিগ্রাম ছিল, কিন্তু আমার নামে ছিল না।

তখন সেই লোকটির সঙ্গে আলাপ হলো। সে বললে, আমাদের হোটেলে উঠবেন? বললুম কীরকম দর? সে বললে বেশী নয়। আঠারো লিরা। লিরা যে এক শিলিংয়ের চার ভাগের এক ভাগ—একথা আমার মনে এলো না। একরাত্রি থাকবো, তার জন্তে আঠারো শিলিং চায়। বললুম খাবার সমেত? সে হেসে বললে, তা কী করে হবে? তখন তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, দেখ, আমার বন্ধুকে আনতে প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছি। তিনি যা বিবেচনা করবেন তাই হবে।

এবার প্ল্যাটফর্মের টিকিট দিতে গিয়ে দেখি একই টিকিটে ছুঁবার ঢুকতে দেয় না! নতুন টিকিট কেন্‌বার মতো খুচরো মুদ্রা ছিল না। নোট ভাঙাতে হবে। তখন আবার সেই মানুষটির শরণাপন্ন হলুম!

প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে পায়চারি করছি, এমন সময় পকেট হাতড়ে দেখি, স্ট্রেকসের রসিদটা গেছে হারিয়ে। মাথায় বাজ পড়ল। স্ট্রেকস ফিরে পাবো না, বন্ধুও আসবেন না, রাত্রে হোটেল যদি-বা পাই আঠারো শিলিং দিয়ে—শোবো কী পরে?

কাঁদো-কাঁদো হয়ে পায়চারি করতে লাগলুম! ট্রেন কিছু বিলম্ব করে এলো। একবার চোখ বুলিয়ে গেলুম—কেউ নেই। হতাশ হয়ে প্ল্যাটফর্ম ছাড়তে যাচ্ছি—দূরে কে আসছে ও? বন্ধু?

ছুটে গিয়ে আশ্চর্য হবার সময় না দিয়ে কাঁধে হাত রাখলুম। বললুম, বন্ধু, আগে আমাকে বাঁচাও। আমার স্ট্রেকসের রসিদ গেছে হারিয়ে।

বন্ধু কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনিও রাত জেগে চব্বিশ ঘণ্টা এক ট্রেনে বসেছিলেন। Brenner Pass দিয়ে না। 'Tarvisio ও Venice দিয়ে। ভয়ানক ক্লান্ত।

তারপর স্ট্রটকেন্স কেমন করে উদ্ধার করা সে গেল অনেক ব্যাপার। হোটেলের সেই মানুষটি সাহায্য করেছিল। তার হোটেলে উঠলুম—ততক্ষণে বুঝেছি সাড়ে চার শিলিং বাস্তবিক বেশী ভাড়া নয়। রাত্রে খেয়ে দাম দেবার সময় পকেট হাতড়ে দেখি—স্ট্রটকেন্সের রসিদ।



দেশে

আমার জাহাজ যখন বস্কের ব্যালার্ড পীয়ারে ভিড়ল তখনো আমি ঘুমিয়ে। উত্তেজনায় অর্ধেক রাত ঘুম হয়নি। যেই ভোর হয়েছে অমনি স্টুয়ার্ড এসে জাগিয়ে দিয়ে বললে, বস্কে এসেছে। ক্যাবিনের পোর্টহোল দিয়ে দেখলুম নানা রঙের কাপড় পরা দেদার লোক জাহাজ থেকে ডাক নামাচ্ছে আর বিষম গোলমাল করছে। এত কাল পরে দেশের মাটি দেখে যদি বা আনন্দ হলো, দেশের লোকের মুখরতা যেন আমার কান মলে দিলে।

পনেরো দিন জাহাজে বন্দী থেকে পা দিয়ে ভুঁই ছুঁইনি। জাহাজ থেকে প্রাতরাশ সেরে যেই নেমেছি ইচ্ছা করল বুনো হরিণের মতো আগে খানিকটে দৌড়াদৌড়ি করি। বরাত এমনি মন্দ যে আমার সব চেয়ে বড় ট্রান্সটাকে নিচে নামাতে বলেছিলুম, নিচে খুঁজে পেলুম না। তাই বারম্বার জাহাজের উপর তল করতে করতে একটা ম্যারাথন দৌড় হয়ে গেল।

একজন বন্ধু আমাকে নিতে এসেছিলেন, তিনি আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গিয়ে বললেন, এবার বাঙালী-বাবুটি সজে কলতলায় স্নান করে এসো।

খালি পায় আর খালি গায় এমন আরাম লাগছিল স্নান করে উঠে। ঠাণ্ডা লাগবার ভয় একটুও ছিল না ইউরোপের মতন। বন্ধু ডাল ভাত মাছের ঝোল দই সন্দেশ রসগোল্লা

ইত্যাদির আয়োজন করেছিলেন। আমি লোভ সংবরণ না করতে পেরে খুব কম করেই খেলুম, কিন্তু তার পরিণাম যে কী হবে তা অনুমান করতে পারিনি। বিদেশী খাবার খেতে খেতে পেটটা যে বিদেশী হয়ে গেছে তা কেই বা মনে রেখেছিল!

একদিন বস্বেতে থেকে পদে পদে ভারতবর্ষকে ভালো মনে হতে লাগল। এমন শান্তি কোথায়! পশুপাখী মানুষের সঙ্গে নির্ভয়ে বাস করছে, ছাগলছানা আর মানবশিশু গাছ-তলাতে এক সঙ্গে শোয়াবসা করছে—এ কি ইউরোপে দেখবার জো ছিল! কেমন গভীর মৃদুগতি নম্র মেয়েগুলি, কত রকমের পাগড়ি বাঁধা মরাঠা গুজরাতি কাবুলী মাদ্রাজী পারসী মাড়োয়ারী ইত্যাদি পুরুষ! এত জাতের মানুষকে নিজের ছেলে বলবার অধিকার ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশের আছে! দেশের সব কিছু আমার মিষ্টি লাগছিল। আমাদের গোরুগুলি যেন আরেকটা জাতের জীব। ইউরোপের গোরুর থেকে এত আলাদা রকম এদের ভাবময় চাউনি, এদের মানুষের সঙ্গে স্নেহ ব্যবহার, এদের ক্ষুদে ক্ষুদে গড়ন। ইউরোপের গোরুগুলো রাক্ষুসে জানোয়ার। মানুষের সঙ্গে ওদের এমন মৈত্রী নেই বলেই ওদের মাংস খেতে মনে লাগে না।

ট্রেনে উঠে কলিক আরম্ভ হলো। সারা রাত সারা দিন পেটের ভিতর সমুদ্র মন্থন চলল। জানালা দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখে তৃপ্তি হচ্ছিল না। মাঠ, পাহাড়, চেনা গাছ, গোরুর গাড়ী, কৃষাণ, সন্ন্যাসী, গরম চা-ওয়ালা, প্রচুর রৌদ্র, তারাময়

রাত, হিন্দী গান, ওড়িয়া কথা, বাংলার ধানভরা ক্ষেত, কলকাতা।

তার পর মুখ দিয়ে বেফাঁস ইংরেজী বুলি বেরিয়ে যায়। পায়ে পা লেগে গেলে “সরি” বলে ফেলি। কিছু একটা চাইতে গেলে “এক্সকিউজ্ মি” ও পেলো “থ্যাঙ্ক ইউ”। কিন্তু ছ’দিনেই সব ঠিক হয়ে গেল। বাবার সঙ্গে খাবার সময় ছুরি কাঁটার অভাবে হাত শূঁড়শূঁড় করছিল না এবং জল দিয়ে হাত মুখ ধোবার সময় অসোয়াস্তি বোধ হচ্ছিল না। কেবল কষ্ট হচ্ছিল মেজের উপর আসন পেতে বসতে।

এখন ইউরোপকে মনে পড়ে কি না? খুব মনে পড়ে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে ফিরে যাই। এবার তো পথঘাট জানি। ক’দিনেরই বা পথ! Cook-এর দোকানে টিকিট কিনে কলকাতা থেকে বম্বে, বম্বে থেকে মার্সেল্‌স্, মার্সেল্‌স্ থেকে যেখানে খুশি। পৃথিবীটা নেহাৎ ছোট মনে হচ্ছে। সব যেন নখদর্পণে।

এখন মনে হচ্ছে ইউরোপে গিয়ে আর য্যাডভেঞ্চার নেই। য্যাডভেঞ্চার আমার এই জেলায়। এখানে কথায় কথায় ট্রেন ট্যাক্সি বাস্ পাওয়া যায় না, এমন রাস্তাও আছে যাতে সাইকেল চলে না, এমন জায়গাও আছে যেখানে গোরুর গাড়ীও যায় না। পায়ে হাঁটায় মতো য্যাডভেঞ্চার এ যুগে আর কী আছে।

আমার ঘরের সামনে একটা চতুষ্কোণ মাঠ। তাতে গোরু বাছুর ছাগল ছাগলছানা গাধা ও ভেড়ার ভিড়। শালিক টিয়া

কাক কোকিল শ্যামা দোয়েল ফিঙে চড়ুই মুরগী চিল দিন রাত
কাছে কাছে ঘুরছে ও গলা সাধছে। অসংখ্য ফুল ও আমের
মুকুল এমন সুগন্ধ দেয় যা ইউরোপে কখনো পাইনি। ‘যে যায়
সে গান গেয়ে যায়’ আমার ঘরের পাশের রাস্তায়। সুখে
আছি।

তবু ইউরোপের জগ্রে মন কেমন করে। ওখানে যে
আমার কত প্রিয় জন আছে!

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

ফাল্গুন চৈত্র ১৩৩৬
